অশুভ ১৩

অনীশ দাস অপু



অশুভ ১৩

প্রথম প্রকাশ:ন ২০০৫

অশুভ ১৩

তেরো বছরের নরমান ওয়েরমের আতঙ্কে সিঁটিয়ে রয়েছে। ঢোলা সুট পরনে তার, এ নিয়ে অস্বস্তিও কম নয়। মা আর ছোট বোনকে নিয়ে ট্যাক্সির পেছনের আসনে মুখ শুকনো করে বসে আছে সে। ট্যাক্সি ছুটে চলেছে অসংখ্য গাড়ির মাঝ দিয়ে। ড্রাইভারের পাশে বসেছেন ওর বাবা।

'এবারের ছুটিটা বেশ মজার কাটবে,' ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন বাবা। নরমান কোন মন্তব্য করল না। সে জানে বাবা ভুল বলেছেন। তার ধারণা ভয়ানক কিছু একটা ঘটতে চলেছে। আজ শুক্রবারের ১৩ তারিখ। ক্যাব ছুটছে ম্যাসাচুসেটসের বোস্টন শহরের ১৩ নম্বর রাস্তা দিয়ে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ নম্বর রাজ্য। ঘড়ি দেখল নরমান। প্রায় একটা বাজে। মিলিটারি সময় ১৩০০ ঘণ্টা।

১৩! নরমানের মস্তিষ্কে যেন গরম লোহার ছ্যাঁকা লাগল সংখ্যাটা মনে করে। পকেট থেকে খরগোশের পা বের করে হাতের তালুতে ঘষতে লাগল সে।

'ভাইয়া, আবার সেই জঘন্য জিনিসটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ!' বলল ছোট বোন পলা। 'তোমার যে কী কুসংস্কার!' 'কীসের কুসংস্কার!' ধমক দিল নরমান। 'তোরা কেউ বুঝতে পারছিস না কী ঘটতে চলেছে? আমাদের সামনে ভয়ানক কোন বিপদ ওঁৎ পেতে আছে–পৈশাচিক কিছু। সোজা ওটার ফাঁদে গিয়ে পড়ব।'

ওর বাবা ঘাড় ঘুরিয়ে কটমট করে তাকালেন ছেলের দিকে। 'নরমান, ফাজলামো অনেক হয়েছে। আর না। ফালতু কুসংস্কার ছাড় তো। ১৩ সংখ্যাটা নিয়ে এত লাফালাফি করিস কেন? আমরা মজা করতে যাচ্ছি। এসব কুসংস্কার বাদ দে। নইলে নিজের মজা মাটি তো করবিই, আমাদেরটাও। বোঝা গেছে?'

নরমান চুপচাপ বসে রইল। কোন মন্তব্য করল না। তর্ক করে লাভ কী? গম্ভীর মুখে ভাবছে সে। এরা আমার কথা শুনতেই চাইবে না। বুঝবেও না।

'হোটেল আর কদ্দূর?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন ড্রাইভারকে।

'এই তো সামনে, সার,' জবাব দিল ড্রাইভার।

নীরবতা নেমে এল গাড়িতে–আরও তেরোটি ব্লক পার হচ্ছে যান্ত্রিক বাহন। এক, দুই করে গুনছে নরমান।

অবশেষে উইলমন্ট রিজেন্সি হোটেলের সামনে গাড়ি থামাল ড্রাইভার, সাথে সাথে কেমন অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো নরমানের। লবি ধরে হাঁটছে ওরা, অনুভূতিটা জোরাল হয়ে উঠল তার মাঝে।

'আমি আগেও এখানে এসেছি,' বলল সে। 'কী বকবক করছিস, নরমান,'

বাবা মৃদু ধমক দিলেন। 'তুই এর আগে জীবনেও বোস্টনে পা দিসনি।'

নরমান তাকাল চারপাশে। 'কিন্তু সবকিছু এত পরিচিত লাগছে!'

পলা চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'তুমি সত্যি একটা অদ্ভুত ভাই!'

'প্লিজ, নরমান,' অনুনয় মা'র গলায়। 'আবার শুরু করিস না।'

'তোর ফালতু প্যাঁচাল শুনে শুনে আমি ক্লান্ত,' থমথমে গলায় বললেন বাবা। 'এখন একটু ক্ষ্যামা দে, নাকি?' স্পষ্ট বিরক্তি তাঁর চেহারায়, এগিয়ে গেলেন রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে। ওখানে তাল গাছের মত লম্বা এক মহিলা, বড় বড় কুচকুচে কালো চোখ, ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল।

মনের মধ্যে রাগ পুষে, কালো মুখ নিয়ে লবিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল নরমান। ওর মা আর বোন বাবার সঙ্গে রিসেপশন ডেস্কে। নরমান নিশ্চিত এ হোটেলে সে আগেও এসেছে। ফুল আঁকা গোলাপি সবুজ কার্পেট, নতুন দেখতে গোলাপরঙা সোফা, সুসজ্জিত স্ফটিকের ঝাড়বাতি, এ সবই ও আগে দেখেছে…কিন্তু কবে বা কখন?

হঠাৎ অদ্ভুত, ঘররর একটা শব্দ শুনতে পেল নরমান। পাঁই করে ঘুরল, হোটেল এলিভেটর থেকে আওয়াজটা আসছে।

আগেকার মডেলের রেপ্লিকা বা নকল। এ এলিভেটর অবশ্যই আগে কখনও দেখেছে নরমান।

পুরানো যন্ত্রটার দিকে হেঁটে গেল সে। খাঁচার মত গরাদ দেওয়া জিনিসটার মাঝ দিয়ে এলিভেটরের দিকে তাকাল। অন্ধকার, আয়তাকার একটা গর্ত, তাতে মোটা মোটা বিদ্যুতের তার ঝুলছে। এক লোকের মাথা দেখতে পেল নরমান, তারপর পুরো শরীরটা। এলিভেটর নিয়ে উঠে এল সে। খাঁচার মধ্যে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'উপরে যাবে?'

এ লোক নিশ্চয়ই এলিভেটর অপারেটর। গেটের মত দেখতে চকচকে দরজা খুলল সে। এলিভেটরের মেঝেতে সবুজ কার্পেট, দেয়ালে আয়না।

'না,' পিছিয়ে এল নরমান। অপারেটরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। লোকটা বেঁটেখাটো, মাথা ভর্তি লাল চুল, থুতনিতে মস্ত আঁচিল।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

নরমান লোকটার উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। একে কোথাও দেখেছে সে। কিন্তু কোথায়?

'আ, আমি বোতামে চাপ দিইনি,' বিব্রত গলায় বলল নরমান। 'এলিভেটরে ওঠার কোন ইচ্ছেও আমার নেই।'

বেঁটে লোকটা কাঁধ ঝাঁকাল শুধু, কিছু বলল না। নরমান দ্রুত ফিরে এল বাবা-মা আর পলার কাছে। এক বেল বয় একটি কার্টে ওদের মাল তুলছে। বেল বয়টিকে প্রথমে বাচ্চা ছেলে ভেবেছিল নরমান। লক্ষ করতে বুঝল এ বামন। মস্ত বড় মাথাটা ক্ষুদ্র শরীরের সাথে একেবারেই বেমানান।

'মা,' মাকে এক পাশে টেনে নিয়ে ফিসফিস করল নরমান। 'আমি এখানে

থাকতে চাই না। আমার কেমন ভয় লাগছে।'

'কেন! হোটেলটা তো খুবই সুন্দর!' চেঁচিয়ে উঠলেন মা, দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন চারপাশে।

ওর বাবা পেছন পেছন চলে এসেছেন। 'আবার কী হলো?'

'ঠিক বোঝাতে পারব না,' শুরু করল নরমান, 'তবে কোথাও একটা ভজকট আছে।'

'কী?' অধৈর্য গলা বাবার।

'জানি না। তবে কিছু একটা ঘটবে মনে হচ্ছে। অদ্ভুত কিছু।'

হেসে উঠল পলা। 'তুমি নিজেই তো অদ্ভুত।'

'কোন অদ্ভুত ঘটনাই ঘটবে না,' বললেন বাবা। 'এসব নিয়ে কথা বলতে তোকে মানা করলাম না!'

নরমান উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল কাঁধে মায়ের হাতের স্পর্শ পেয়ে। 'শান্ত হ, বাপ,' বললেন তিনি। 'মাথা থেকে আজে বাজে চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেলে দে। অন্তত আমার জন্যে এটুকু করবি না?' কথাটা শেষ করেই বেল বয়ের পেছনে হাঁটা দিলেন মা। সে ওদের ঘর দেখিয়ে দেবে।

'কেউ আমার কথা শুনতে চায় না,' বিড়বিড় করল নরমান। এলিভেটরের দিকে পা বাড়াল সে পরিবারের পেছন পেছন।

'কোন্ ফ্লোর?' নিরাসক্ত গলায় জানতে চাইল অপারেটর।

'রুম নাম্বার ১৩০২,' হাতের চাবি দেখে বললেন বাবা।

'ওহ্, দারুণ!' লাফিয়ে উঠল পলা, চোখ টিপল ভাইকে। 'তেরো নম্বর ফ্লোর!'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল নরমান, ঝট্ করে নেমে পড়ল এলিভেটর থেকে। 'আমি এ হোটেলে থাকব না। তেরো নম্বর ফ্লোরে তো নয়ই!'

'ফিরে আয় বলছি!' শাসালেন মা।

'প্রশ্নই ওঠে না,' খেঁকিয়ে উঠল নরমান। নিতম্বে হাত, চেহারায় বেপরোয়া ভাব।

অপারেটরকে অপেক্ষা করতে বলে এলিভেটর থেকে নেমে এলেন বাবা, নরমানের সামনে এসে বললেন, 'অনেক হয়েছে, নরমান। ফাজলামো রাখ।'

'আমি ফাজলামো করছি না,' দৃঢ় গলা নরমানের।

প্রচণ্ড রাগে মুহূর্তের জন্য কথার খেই হারিয়ে ফেললেন বাবা। নিজেকে সামলে নিয়ে গোলাপরঙা সোফার দিকে আঙুল তুলে হিম গলায় বললেন, 'আমরা আমাদের ঘরে যাচ্ছি। আর তুই এ সব ফাজলামো বাদ না দেওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবি।'

নরমান চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি কি বাচ্চা ছেলে নাকি যে যা বলবে তা-ই শুনতে হবে।'

'তুই বাচ্চা ছেলেরও অধম,' বললেন বাবা। 'দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত আচরণ

করছিস।'

'না, করছি না। আমি অনেক বড় হয়ে গেছি। তুমি আমাকে বাচ্চা ভাবলেও আমার কিছু আসে যায় না।'

বাবা ঝাড়া কয়েক সেকেন্ড আগুন চোখে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে। কষে চড় মারার ইচ্ছেটা দমন করলেন বহু কষ্টে। এলিভেটরে ফিরে গেলেন তিনি। 'উপরে যান,' বললেন অপারেটরকে। কটমট করে তাকালেন ছেলের দিকে। 'তোকে কয়েক মিনিটের মধ্যে উপরে দেখতে চাই।'

'কিন্তু আমি তোমার চেহারা আর কখনও দেখতে চাই না,' তারস্বরে চেঁচাল নরমান। 'তোমাদের কাউকে না!'

'যা বলবে ভেবে চিন্তে বোলো, খোকা,' একটা লিভার ধরে টান দিল অপারেটর। 'অনেক সময় বেমক্কা কথাও ফলে যায়।'

'ফলে গেলেই ভাল!' একই জোরে চেঁচাল নরমান। রাগে জ্বলছে শরীর।

চকচকে দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর একটা গুঞ্জন উঠল, নরমান দেখল তার পরিবারকে নিয়ে উপরে রওনা হয়েছে এলিভেটর। এক মুহূর্ত পরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ লবিতে দাঁড়িয়ে রইল নরমান, প্রতি মিনিটে বাড়ছে ক্রোধ। শেষে রাগ সামলাতে না পেরে ঝড়ের বেগে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল সে দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে। অচেনা শহরে একা একা ঘুরতে লাগল। মূর্তি বোঝাই একটি পার্কের বেঞ্চিতে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর হাঁটা দিল বাইক চলা একটি পথ ধরে। হাঁটতে হাঁটতে একটা গোরস্তানের সামনে চলে এল। নিজেকে ভীষণ একা, রদ্দি আর বাতিল মাল মনে হচ্ছে, যেন বাবা ওকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেছেন।

গোরস্তানের পাশের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে নরমান ভাবতে লাগল কিছুক্ষণ আগে কী রকম ব্যবহার করে এসেছে সে তার পরিবারের সঙ্গে। আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে লাগল মাথা। সবার সঙ্গে সে যাচ্ছে তাই আচরণ করেছে! দোষ সম্পূর্ণ ওরই। সাধে কি আর ওর বন্ধুরা ওকে 'রগচটা, অদ্ভুত ভাবুক' বলে ডাকে। বন্ধুরাও জানে কুসংস্কারে সাংঘাতিক বিশ্বাস তার। কিন্তু কী করবে নরমান? কীভাবে সে তার বাবা-মাকে বোঝাবে এক অদ্ভুত, অশুভ শক্তি ক্রমে ওকে গ্রাস করে ফেলছে?

আগে কখনও কুসংস্কার নিয়ে মাথা ঘামাত না নরমান। এখন সে কালো বেড়াল ভয় পায়, মইয়ের নীচে দিয়ে কক্ষনো হাঁটে না, বিশেষ করে ১৩ সংখ্যাটির প্রতি তার প্রচণ্ড ভয়। এই যে সে ফুটপাথ ধরে হাঁটছে, সতর্ক নজর রয়েছে যাতে কোন ফাটল বা গর্তে পা না পড়ে। এটাও এক ধরনের কুসংস্কার।

নরমান জানে অবশেষে তাকে হোটেলেই ফিরতে হবে, সে ওদিকে পা বাড়াল। তবে এখুনি হোটেলে ঢোকার ইচ্ছে তার নেই। জায়গাটাকে সে শুধু ভয় পায় বলে নয়, এখনও রাগটা পড়েনি যে! মাত্র আড়াইটা বাজে। এত তাড়াতাড়ি

হোটেলে গেলে ব্যাপারটা ওর জন্য অস্বস্তিকর হয়ে উঠবে।

কিন্তু কী করবে নরমান? সময় কাটাবে কীভাবে? রাস্তার ওপারে একটা সিনেমা হল-এ আটকে গেল চোখ। সিনেমা দেখে সময় কাটানো যায়। দ্রুত রাস্তা পার হলো নরমান। টিকেট কিনে ঢুকে পড়ল অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে।

ছবির টাইটেল দেখানো শুরু হয়ে গেছে। ছবির নাম 'কলিশন কোর্স'। নাম দেখে মনে হলো প্রচুর অ্যাকশন আছে। কিন্তু একটা খামার বাড়ির কে দখল নেবে তা নিয়ে এক লোক আর এক মহিলার বিরক্তিকর দ্বন্দ্বের নিয়ে ছবি। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো ছবি চলার সময় নরমানের মনে হতে লাগল এ ছবি আগেও দেখেছে সে—অনেক আগে, তবে কবে, কোথায় মনে করতে পারল না। রদ্দি মার্কা সিনেমা আর ভ্রমণের ক্লান্তি ঘুম এনে দিল নরমানের চোখে। ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে এসে নরমান দেখে রাত নেমেছে। বাবা-মা ওকে এত দেরিতে ফিরতে দেখলে নিশ্চয়ই রেগে যাবেন, ভাবল নরমান। দ্রুত পা চালাল হোটেল অভিমুখে। চোখে ঝাপসা দেখছে সে, হাড় আর জয়েন্টগুলো আড়ষ্ট ও ব্যথা করছে, এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঝাপটা মেরে ঢুকে পড়ল ওর বিশ্রী সুটের মধ্যে। এ জিনিস বাবা-মা ওকে বানিয়ে দিয়েছেন প্লেনে পরে আসার জন্য। তবে ঢোলা সুটটা কোন কারণে এখন টাইট লাগছে, কলারটাও।

আশ্চর্য! ভাবল নরমান। এ পোশাক তো আমার গায়ে ঢিলে হত।

শীতল বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে হোটেলে ঢুকে পড়ল সে। দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ করেনি নরমান, কিন্তু লবিতে ঢুকেই পার্থক্যটা চোখে পড়ল। অবাক হয়ে দেখল জায়গাটা বদলে গেছে। সব কিছুর যেন বয়স বেড়ে গেছে, গোরস্তানের বাসী একটা গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

এক মুহূর্তের জন্য ভাবল নরমান ভুল কোন হোটেলে চলে এসেছে ও, পরক্ষণে চোখে পড়ল রেজিস্ট্রেশন ডেস্কের উপরে, দেয়ালে ঝোলানো ম্লান সোনালি-বাদামী অক্ষরের প্ল্যাকার্ড: উইলমন্ট রিজেন্সি।

চারপাশে চোখ বুলাল নরমান। গোলাপি-সবুজ রঙের ফুল আঁকা কার্পেট ঠিকই আছে, তবে আগের চেয়ে বিবর্ণ লাগছে দু'এক জায়গায়, ছিঁড়ে সুতো বেরিয়ে গেছে। গোলাপ রঙের সোফা, আগে যা মনে হয়েছে ঝাঁ চকচকে, দেখাচ্ছে জীর্ণ, ডেলার মত, লবির মাঝখানের বড় ক্রিস্টালের ঝাড়বাতিটি জ্বললেও গায়ে ধুলো জমে থাকার দরুন আলো প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।

হঠাৎ নরমান গোঙানির মত ঘররর একটা আওয়াজ শুনল। ঘুরল। হোটেল এলিভেটর থেকে শব্দটা আসছে। ওদিকে ছুটল সে, উপরে গিয়ে মিলিত হবে পরিবারের সঙ্গে। কিন্তু ছোটার গতি মন্থর হয়ে গেল প্যান্টের জন্য। বিচিত্র কোন কারণে তার প্যান্ট এত ছোট হয়ে গেছে, জোরে দৌড়ালে ফট্ করে ছিঁড়ে যেতে পারে।

এলিভেটর এসে পৌঁছুল। নরমান বিকট দর্শন, বয়সের ভারে ক্ষয়ে যাওয়া

গরাদের গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকল।

'উপরে যাবেন?' জিজ্ঞেস করল অপারেটর নিরাসক্ত গলায়।

নরমানের ইচ্ছে করল গলা ফাটিয়ে চিৎকার দেয়। এ সেই আগের অপারেটর, তবে এ মুহূর্তে অনেক বুড়োটে লাগছে, গালে আর কপালে ভাঁজটাজ পড়ে গেছে, মাথার চুলও পাতলা দেখাচ্ছে, থুতনির আঁচিলটা যেন আকারে আরও বড় হয়েছে। লোকটা লম্বা, হলুদ দাঁত বের করে হাসল, 'কী হয়েছে?'

নরমান ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে, মুখে রা নেই।

'কোন্ ফ্লোর?' জানতে চাইল লোকটা।

'তে-তেরো,' অবশেষে বিড়বিড় করে বলল নরমান।

লোকটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকাল নরমানের দিকে। 'এখানে তেরো নম্বর ফ্লোর নেই।'

'অ্যাঁ?' হতভম্ব দেখাল নরমানকে। 'কী বললেন?'

'বললাম এখানে তেরো নম্বর ফ্লোর নেই,' পুনরাবৃত্তি করল লোকটা হিম গলায়।

ঢোক গিলল নরমান। 'এসব ঘটছে কী এখানে?' জিজ্ঞেস করল সে, টের পেল শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ শীতল জল নামছে। 'আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে?'

'উপরে যাবেন কি যাবেন না?' প্রশ্ন করল বুড়ো, ভাবলেশহীন চেহারা।

পিছিয়ে এল নরমান, পা চালিয়ে চলে এল রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে। ধাতব হ্যান্ড বেল ক্রমাগত বাজানোর পরে তাল গাছের মত লম্বা এক মহিলা বেরিয়ে এল ব্যাক রূম থেকে।

এ সেই মহিলা, বড় বড় কালো চোখ। তবে এঁরও বয়স বেড়ে গেছে, নুয়ে পড়েছে কাঁধ।

'কোন সাহায্য করতে পারি?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

নরমান জানাল অপারেটর তাকে বলেছে এ হোটেলে নাকি তেরো নম্বর ফ্লোর বলে কিছু নেই।

মাথা ঝাঁকাল মহিলা। 'ঠিকই বলেছে সে। উইলমন্ট রিজেন্সিতে তেরো নম্বর ফ্লোর ছিল, তবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরে লোকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তেরো নম্বর ফ্লোর তারপর বাদ দেয়া হয়েছে।'

'কী-কীসের অগ্নিকাণ্ড?' কথা জড়িয়ে গেল নরমানের।

'বেশ কয়েক বছর আগে তেরো নম্বর ফ্লোরে আগুন লেগে যায়। সে এক ভয়াবহ কাণ্ড! মেরামতের পরে নাম্বার পাল্টে ফেলা হয়।' কাঁধ ঝাঁকাল মহিলা। 'এ স্রেফ কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়, তবে নাম্বারগুলো এখন ১১...১২...১৩'র বদলে ১১...১২...১৪। কাজেই, সার, আমার ধারণা, আপনি আসলে চোদ্দ নম্বর ফ্লোর খুঁজছেন যা আগে তেরো নম্বর ফ্লোর ছিল।'

'আগুনে,' জিজ্ঞেস করল নরমান, মনে মনে ভাবছে মহিলা তাকে 'সার' সম্বোধন করল কেন, 'কেউ হতাহত হয়েছিল?' মহিলার চেহারা বিষণ্ণ দেখাল।

জ্বী, তিনজন মানুষ মারা যায়।' এক মুহূর্ত বিরতি দিল। 'কিন্তু সে তো অনেক আগের কথা–'

'মারা যায়!' চেঁচিয়ে উঠল নরমান। 'আমার বাবা-মা ছিলেন ওই ফ্লোরে!'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না, স্যার,' বলল মহিলা। 'আমি দুঃখিত যদি–'

কিন্তু মহিলার কথা কানে ঢোকেনি নরমানের। আতঙ্কিত ও হতভম্ব হয়ে সে রওনা দিয়েছে এলিভেটরের উদ্দেশে।

'আমার পরিবার কোথায়?' বুড়ো অপারেটরকে ধমকের সুরে প্রশ্ন করল সে।

খাঁচার ভিতরে লোকটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল।

'তুমি সব জানো, না?' খেঁকিয়ে উঠল নরমান।

মাথা দোলাল লোকটা।

'আমার পরিবারের কী করেছ তুমি?'

'আমি কিছু করিনি,' ঠাণ্ডা গলা লোকটার। 'আপনি করেছেন।'

'আমি করেছি মানে?' গলা কেঁপে গেল নরমানের।

'আপনাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম,' বলল বুড়ো। 'কোন কিছু চাইবার আগে ভেবেচিন্তে তা কামনা করতে হয়।'

'ঠিক আছে, আমি এখন ১৩০২ নাম্বার রুমে যেতে চাইছি!'

'মানে ১৪০২, সার,' অপারেটর শুধরে দিল তাকে।

'আমাকে স্রেফ উপরে নিয়ে চলো!' হুকুম দিল নরমান।

'আপনি যা বলেন, সার।'

'আর সার সার করবে না,' ঘেউ করে উঠল নরমান। ঢুকে পড়ল এলিভেটরে। আর তখন দেয়ালের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল।

মাঝ-বয়েসী হয়ে গেছে সে!

ঝনঝন শব্দে গেট টেনে বন্ধ করল অপারেটর, টান দিল একটি লিভার ধরে, ক্যাচ কোঁচ শব্দ তুলে উপরে রওনা হয়ে গেল এলিভেটর। ঘেমে নেয়ে গেছে নরমান, দাগপড়া, ফাটা আয়নায় নিজের ভাঙা চোরা প্রতিবিম্ব থেকে চোখ সরাতে পারছে না। তারপর বহু কষ্টে ফ্লোর ইন্ডিকেটরের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। বিস্ফারিত চোখে দেখল এক এক করে জ্বলে উঠছে সংখ্যাগুলো: ৯…১০…১১…১২…১৪!

মৃদু ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল এলিভেটর। 'আপনার ফ্লোর, সার।' বলল অপারেটর, মুখে অশুভ হাসি।

পুরানো হোটেলটির বিবর্ণ হলওয়েতে পা রাখল নরমান। চারদিকে অযত্নের ছাপ, বোঝা যায় অনেক আগে এখানে রিপেয়ারের কাজ চলেছে। সে দ্রুত ১৪০২ লেখা রুমের সামনে চলে এল। দমাদম ঘুসি মারতে লাগল দরজায়।

ক্যাঁআচ শব্দে খুলে গেল দরজা, বদমেজাজি চেহারার এক বুড়ি উঁকি দিল। 'কে? কী চাই?' খ্যাঁক করে উঠল সে।

'আমি আমার বাবা-মাকে খুঁজছি,' ব্যাকুল গলায় বলল নরমান। 'আমার বোন পলাকেও। ওরা সবাই এ ঘরে থাকত, তবে তা অনেক আগে। আমি ওদেরকে

এখন কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কেটে পড়ুন তো। যত্তসব যন্ত্রণা,' ঘোঁত ঘোঁত করল মহিলা, নরমানের মুখের উপরে ঠাস করে বন্ধ করে দিল দরজা।

নরমান ছুটে এল এলিভেটরে। 'আমার পরিবারের কী হয়েছে?' কাঁদো কাঁদো গলা।

'আগুনে পুড়ে মারা গেছে,' জবাব দিল অপারেটর, শয়তানি হাসি মুখে।

'আর আমি, আমার এরকম দশা হলো কী করে? আমি তো বাচ্চা একটা ছেলে ছিলাম, আর এখন–'

'এখন আপনি বড় হয়ে গেছেন,' মুখ বাঁকাল বুড়ো। 'অন্তত এখন আর কেউ আপনাকে বাচ্চা ছেলে বলে অবহেলা করবে না।'

'কিন্তু আমি তো বাচ্চা ছেলেই,' বলল নরমান। 'অন্তত ছিলাম।'

কাঁধ ঝাঁকাল বুড়ো। 'আপনি যা কামনা করেছিলেন পেয়ে গেছেন!' ভয়ঙ্কর খনখনে গলায় হেসে উঠল সে, একটা লিভার ধরে টান দিল।

ভীত, সন্ত্রস্ত নরমান দেখল এলিভেটর নীচে নামতে শুরু করেছে। ভিতরে, ময়দার তালের মত তেলতেলে বুড়োর মুখটা ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল, এলিভেটর নামছে; ভৌতিক, খনখনে হাসি হেসেই চলেছে লোকটা, তারপর নেই হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।

টলতে টলতে কয়েক পা পিছিয়ে এল নরমান। 'মা! বাবা!' বারবার চিৎকার করল ও একা হলওয়েতে দাঁড়িয়ে যা এক সময় উইলমন্ট রিজেন্সির তেরো নম্বর ফ্লোর ছিল। ওর চিৎকারে হলঘরের দু'পাশের কয়েকটি ঘরের দরজা খুলে গেল, উঁকি দিল বাসিন্দারা। বিরক্ত ও বিস্মিত হয়ে দেখল হলওয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক মধ্য বয়স্ক লোক তার বাবা মাকে ডাকছে আর হাপুস নয়নে কাঁদছে...বাচ্চা ছেলেদের মত।

পিশাচ বাড়ি

আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল মার্ক। দৃশ্যটা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য। মুখটি মরার মত সাদা, চোখ আর থুতনির নীচে কালো রঙের পোঁচ। ব্যাক ব্রাশ করা কালো চুল চকচকে কালো একটা টুপির মত লাগছে। হাসার সময় ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘণ্টাখানেক আগে লাগানো একজোড়া শ্বদন্ত।

'মার্ক, রেডি হয়ে নাও,' একটা কণ্ঠ ভেসে এল দোরগোড়া থেকে। 'ওরা এসে পড়বে এখুনি।'

আয়নার সামনে থেকে ঘুরল মার্ক। তাকাল প্রধান সহকারী এলিয়টের দিকে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। এলিয়টের সুদর্শন চেহারাটা মেকআপ নেওয়ার ফলে এ মুহূর্তে বিকৃত দেখাচ্ছে। তবে পিশাচ বাড়িতে আসা মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপতে তারা নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল। কিন্তু কালো পোশাক পরা প্যাকাটি শরীর আর শুকনো মুখটার দিকে এক বারের বেশি কেউ তাকায় না।

পিশাচ বাড়ির ভারী ওক কাঠের পাল্লা জোড়া ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে খুলে যেতে ওদিকে মনোযোগ ফেরাল মার্ক। স্পিকারে বেজে উঠেছে পরিচিত যন্ত্রসঙ্গীত। হরর ছবির মিউজিক ট্র্যাকের মত, শুনলেই শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ জল নামতে থাকে মার্কের। ঘরের অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে আছে মার্ক। দর্শনার্থীরা এখনই ঢুকবে ভিতরে। শুরু করবে ট্যুর।

একে একে ওরা পা রাখল এন্ট্রান্স হল-এ, চেহারায় ফুটে আছে নার্ভাস ভঙ্গি। ঘরের মধ্যে হঠাৎ ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, লাউডস্পিকারে ভেসে এল বজ্র নিনাদ। লাফিয়ে উঠল সবাই। তারপর এলিয়ট মসৃণ গলায় পিশাচ বাড়ি দেখার জন্য স্বাগত জানাল সকলকে, সতর্ক করে দিল ঘরগুলোর অন্ধকার ছায়া আর ওঁৎ পেতে থাকা আতঙ্কের ব্যাপারে। মার্ক ঈর্ষা নিয়ে লক্ষ করল মেয়েগুলো হাঁ করে তাকিয়ে আছে এলিয়টের দিকে। তারপর কান ফাটানো, কর্কশ একটা চিৎকার শোনা যেতে রেডি হয়ে গেল মার্ক। এবার ওর বলার পালা।

'এদিক দিয়ে আসুন, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ,' কণ্ঠে যতটা সম্ভব থমথমে ভাব ফুটিয়ে তুলল মার্ক। 'আমার সঙ্গে সিটিংরুমে চলুন।' দর্শকরা ওর দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল একবার, তারপর মার্কের মেলে ধরা সদর দরজার দিকে পা বাড়াল। হাতে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে দলটার পেছনে থাকল মার্ক।

সিটিংরুমে সবার আগে গটগট করে ঢুকে পড়ল এক স্বর্ণকেশী। প্রায় সাথে সাথে সে এমন গগনবিদারী চিৎকার দিল, বাকিদের আত্মা কেঁপে গেল। আড়ষ্ট হাসি ফুটল তাদের ঠোঁটে, চোখে ভয়। দরজা বন্ধ করে দিল মার্ক। দর্শনার্থীদের পেছন পেছন অন্ধকার সিটিংরুমে ঢুকল। এখানে চেয়ার এবং সোফায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মোমের লাশ। স্পটলাইটের আলোয় আলোকিত তাদের শরীর। কী ভয়ঙ্কর চেহারা একেক জনের।

মার্ক লাশগুলোর দিকে না তাকানোর চেষ্টা করল। ওগুলো ওর কলজে শুকিয়ে দেয়। এক রোগা তরুণ, ঘাড়ে গোটা চারেক আঘাতের চিহ্ন, চিৎ হয়ে পড়ে-আছে সোফায়। মুখখানা মৃত্যু যন্ত্রণায় বীভৎস দেখাচ্ছে। এদের দিকে না তাকাতে চাইলেও চোখ বারবার ওদিকেই চলে যেতে চায়। মার্ক জোর করে দর্শকদের দিকে নজর ফেরাল। বিকট চেহারার সব লাশ দেখে কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে গেছে বলে শুনেছে মার্ক। আজ সেরকম কোন ঘটনা ঘটল না। শুধু একটি মেয়ে ভয়ানক আঁতকে উঠল কাঁধে মার্কের আঙুলের টোকায়। মার্ক তাকে সামনে বাড়তে বলছে।

পিশাচ বাড়ির পরের অংশ লাইব্রেরি। লাইব্রেরির দরজা খোলার সময় উত্তেজনায় হাত কাঁপছিল মার্কের। দরজা খুলে দর্শকদের ইঙ্গিত করল ভিতরে

ঢুকে পড়তে। উঁকি দিল লাইব্রেরি ট্যুর গাইড লিসার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লিসা। চোখ জোড়া ভারী ও কালো মেকআপের কারণে ভয়ঙ্কর লাগছে। লিপস্টিক পরা লাল টকটকে ঠোঁট জোড়ায় রহস্যময় হাসি। তারপর, বেড়ালের মত, লিসা আঁধারের মাঝে যেন পিছলে চলে এল মার্কের পাশে। 'আজ রাতে পার্টি আছে, মার্ক,' ফিসফিস করল সে কানের কাছে মুখ এনে। 'কিছুক্ষণ পরেই···দেরি কোরো না।'

লিসার গায়ের ভারী পারফিউমের গন্ধে মার্কের বুক শুকিয়ে এল, পাঁজরের গায়ে দমাদম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। মেয়েটা কামনামদির দৃষ্টি (ফোটাল) বাদামী চোখে, দীর্ঘ একটা সময় তাকিয়ে রইল মার্কের দিকে, তারপর লাইব্রেরির আঁধারে মিশে গেল যেখানে মোমের তৈরি পাঠকরা চেহারায় তীব্র আতঙ্কের মুখোশ এঁটে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

দলের শেষ দর্শক লাইব্রেরিতে ঢোকার পরে মার্ক অনিচ্ছাসত্ত্বেও বন্ধ করে দিল দরজা। লিসাকে আর দেখা যাচ্ছে না। উত্তেজনায় মাথাটা হঠাৎ কেমন ঘুরে উঠল। পিশাচ বাড়িতে অল্প ক'দিন হলো কাজ করছে মার্ক, অন্যান্য গাইডরা ওকে পাত্তাই দিতে চায় না, সেই তাদের সঙ্গে আজ আর কিছুক্ষণ বাদে পার্টি—ভাবা যায়!

আজকের দিনটি যেন অসহ্য ধীর গতির—ফুরোতেই চায় না। দর্শকদের একেকটি দল সিটিংরূম থেকে লাইব্রেরিতে যাচ্ছে, লিসার সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছে মার্কের। প্রতিবার ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে মেয়েটা, যেন পার্টি কখন শুরু হবে সে জন্য ওরও সইছে না।

রাত ৮:৪৫। আলোকিত ডায়ালে সময় দেখল মার্ক। বিনোদন পার্ক বন্ধ হবার এখনও পনেরো মিনিট বাকি। আরেকটি দল সম্ভবত আসবে পিশাচ বাড়ি দেখতে। তারপর নিভে যাবে স্পট লাইট, বিল্ডিং-এর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে আজকের দিনের জন্য, গাইডরা বাড়ি ফিরবে। মি. হিলারের চোখ এড়িয়ে গাইডরা কীভাবে পার্টি দেবে মাথায় ঢুকছে না মার্কের। পিশাচ বাড়ির কঠিন ম্যানেজার এ লোক, তার নজর ফাঁকি দিয়ে কারও এদিক-সেদিক কিছু করার জো নেই।

দর্শনার্থীদের শেষ দলটা ওক কাঠের দরজা দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছে এন্ট্রান্স হল-এ, ঠিক আগে আগে এলিয়ট এক পাশে টেনে নিল মার্ককে। 'লিসা তোমাকে পার্টির কথা বলেছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

মুচকি হেসে মাথা দোলাল মার্ক, এই প্রথম বার এলিয়টকে ভাল লাগল তার।

'হিলার যেন তোমাকে দেখতে না পায়,' নিচু গলা এলিয়টের। 'এই শেষ দলটাকে সিটিংরূমে ঢুকিয়ে দিয়ে তুমি কোথাও লুকিয়ে পড়বে। হিলার প্রতিরাতে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে বের হয়, মোমের মূর্তিগুলোর কেউ কোন ক্ষতি করল কিনা পরীক্ষা করে দেখে। সে চলে যাবার পরে আমরা সবাই বেরিয়ে আসব।'

মার্ক জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কোথায় ওরা মিলিত হবে, দরজা খোলার শব্দে চট করে নিজের জায়গায় ফিরে গেল এলিয়ট। শেষ বারের মত বেজে উঠল

ভৌতিক সঙ্গীত, মার্কের শিরদাঁড়া বেয়ে আবার বরফ-জল নামল। হঠাৎ মনে হলো আজ রাতটা শুধু মজার নাও হতে পারে। পার্টিতে যাওয়া মানে চাকরির ঝুঁকি নেওয়া। লিসার চোখ আর পারফিউমের কথা মনে পড়তে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল মার্ক। লিসার জন্য যে কোন ঝুঁকি নেওয়া যায়।

সিটিংরুমে শেষ দলটাকে নিয়ে দুরু দুরু বুকে ঢুকল মার্ক। এ দলের লোকজন যা দেখছে তাতেই চেঁচিয়ে ঘর ফাটাচ্ছে। লাইব্রেরির দরজা যখন খুলল মার্ক, সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে। দেখল লিসা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে ঠোঁটে মদির হাসি এঁকে। শেষ লোকটা লাইব্রেরিতে ঢোকার পরে লিসা চলে এল মার্কের কাছে, ওর গালে আঙুল ছোঁয়াল। 'বেশিক্ষণ লাগবে না,' ফিসফিস করল সে তারপর লাইব্রেরির আঁধারে মিশে গেল।

মার্কের হাঁটু জোড়া দুর্বল ঠেকল, হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে কয়েক গুণ। লাইব্রেরি এবং সিটিংরুমের মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে দিল সে, ঘরের অন্ধকার কোণগুলোতে ফ্ল্যাশলাইট ঘোরাল। সাধারণত রাতের এ সময়টাতে সে দর্শকদের শেষ দলটার সাথে বেরিয়ে পড়ে পিশাচ বাড়ি থেকে, হাঁটা দেয় বাড়ির উদ্দেশে। মনে পড়ল বাসায় ফিরতে দেরি হবার কথা জানাবার এখন আর সুযোগ নেই। মা চিন্তা করবেন। কিন্তু কোন কিছুর জন্য পার্টি মিস করতে পারবে না মার্ক।

সিটিংরুমটা রেইলিং দিয়ে ঘেরা, যাতে দর্শক হাত বাড়িয়ে মোমের মূর্তি ছুঁতে না পারে। মার্ক রেইলিং টপকাল। দেখল দুই মোমের মহিলার আতঙ্কিত চেহারা থেকে ইঞ্চি কয়েক দূরে আছে সে। গায়ে কাঁটা দিল মার্কের, ওগুলোর ছায়ার আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। ফ্ল্যাশলাইটের সরু আলোর রেখায় আলোকিত হয়ে উঠল মখমলের পর্দা। এটা মূর্তিগুলোর ব্যাকড্রপ হিসাবে কাজ করে। এ পর্দার পেছনে কী আছে তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি মার্ক। আজ দেখবে কী আছে। ইতস্তত ভঙ্গিতে সে পর্দার একটা কোণ তুলে আলো ফেলল। দ্রুত কী একটা ছুটে গেল মেঝে দিয়ে। লাফ মেরে পিছিয়ে এল মার্ক, এদিক-ওদিক তাকাল। লুকানোর জায়গা খুঁজছে। পর্দার পেছনে লুকিয়ে পড়ার মত তেমন জায়গা নেই। এমন সময় সদর দরজা খোলার শব্দ শুনল মার্ক। ঝট্ করে পর্দার আড়ালে চলে গেল সে এবং সুইচ টেপার শব্দে পাথরের মূর্তির মত জমে গেল। আলোয় ভেসে গেছে ঘর।

ঘড়ি দেখল মার্ক। ন'টা বাজে। নিশ্চয় হিলার, পিশাচ বাড়ি বন্ধ করার আগে রাতের টহল দিতে এসেছে। মাথাটা সামান্য কাত করে পর্দার সরু একটা ফাঁক দিয়ে তাকাল মার্ক। ম্যানেজার কার্পেটে মোড়া প্যাসেজ ধরে হাঁটছে, সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করছে প্রতিটি মূর্তি, উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে আসবাবের পেছন দিকটা। মোমের মূর্তির মতই স্থির হয়ে রইল মার্ক যতক্ষণ পর্যন্ত না হিলার তার টহল শেষ করল। শেষে বাতি নেভাল সে, চলে গেল লাইব্রেরিতে।

অন্ধকারে সেই সড়সড় শব্দটা আবার শুনতে পেল মার্ক। যেন ইঁদুর ছুটে যাচ্ছে মেঝে দিয়ে। পায়ে ওটার শরীরের স্পর্শ পেল সে। বহু কষ্টে উদ্‌গত

চিৎকারটা ঠেকিয়ে রাখল মার্ক, একটানে পর্দা সরাল, তারপর দৌড় দিল। অন্ধকারে একটা মূর্তির গায়ে হোঁচট খেয়ে কাঁপা হাতে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল মার্ক, পেতলের রেইলিং-এর কাছে, মূর্তিগুলোর দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল, এখানে বসল মার্ক। নিভিয়ে দিল আলো। এখন ওর কাজ অপেক্ষা করা। হিলার তার টহল শেষ করে কখন ফিরে যাবে আর তারপর পার্টি শুরু হবে সে অপেক্ষার প্রহর গোনা।

অন্ধকারে মনে মনে হাসল মার্ক, লিসা পাশের ঘরেই আঁধারে লুকিয়ে আছে ভেবে। লিসাও হয়তো মার্কের কথাই ভাবছে। লাইব্রেরি ঘরের দরজা খুলে লিসার কাছে চলে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে মার্কের। হিলারের কাজ এতক্ষণে শেষ হয়ে যাবার কথা। তবে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে থামিয়ে রাখল। মার্ক ঠিক করেছে অপেক্ষা করবে। এলিয়ট, লিসা কিংবা গাইডদের অন্য কেউ সময় হলেই এ ঘর থেকে ওকে ডেকে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া মার্ককে বসে থাকতেই হবে। কারণ ওদের সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হবে বলেনি ওকে কেউ।

মিনিটগুলো ঘণ্টার মত লাগল মার্কের কাছে ঘুটঘুটে অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে। গা ব্যথা হয়ে গেল, উত্তেজনা বাড়ছে। চিন্তা করল হিলার পিশাচ বাড়ির কোন্ জায়গাটায় এ মুহূর্তে থাকতে পারে। দোতলার কাজ শেষ করে শেষ ঘর মাটির নীচের জেলখানার মত সেলারটাতে হয়তো উঁকি দিচ্ছে। আবার ঘড়ির দিকে তাকাল মার্ক। পোনে দশটা। শিউরে উঠল সে হিম বাতাসে। এয়ার কুলার চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুনেছে রাতের বেলা গোটা বিল্ডিংকে বরফ ঠাণ্ডা করে রাখা হয় যাতে মোমের মূর্তিগুলো শক্ত থাকে।

সিধে হলো মার্ক, সিটিংরুমের লাল কার্পেটে মোড়া সরু প্যাসেজে পায়চারি করতে লাগল। এলিয়ট আর লিসার কথা ভাবছে। ঘরের তাপমাত্রা দ্রুত নামছে, বাড়ছে ঠাণ্ডা। কালো জ্যাকেটের কলার টেনে দিল মার্ক। রাত দশটার সময় সিদ্ধান্ত নিল এন্ট্রান্স হল-এ যাবে সে, এলিয়ট নিশ্চয় ওখানে আছে।

দরজা খুলল মার্ক। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল ছোট ঘরটিতে। আশা করছে যে কোন মুহূর্তে হুম্ করে লাফ মেরে ওর সামনে চলে আসবে এলিয়ট। কিন্তু ঘর সম্পূর্ণ খালি, কালো, প্যানেল করা দেয়ালের কোথাও লুকোবার জায়গা নেই। ভয় লাগল মার্কের, হেঁটে গেল দুই পাল্লার দরজার দিকে। এ দরজা দিয়ে দর্শকরা ঢোকে। দুটি পাল্লাতেই তালা মারা। ধাক্কা দিল মার্ক। খুলল না। ভয়ের ঠাণ্ডা একটা হাত থাবা বসাল মার্কের কলজেতে, এক ছুটে সিটিংরুম থেকে ঢুকে পড়ল লাইব্রেরিতে, হিলার আশপাশে থাকতে পারে সে শঙ্কা আর কাজ করছে না মনে।

'লিসা।' অন্ধকারে হাঁক ছাড়ল মার্ক। কণ্ঠটা প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এল ওর কাছে। তারপর ঘরের মখমলের মত মসৃণ আঁধারে ডুবে গেল। ভয়ের আরেকটা ধাক্কা নিশ্চল দাঁড়া করিয়ে রাখল মার্ককে। হয় এলিয়ট এবং লিসা ওকে নিয়ে খেলছে নতুবা ওদের কথা বুঝতে ভুল করেছে সে। আতঙ্কিত মার্ক মনে করার চেষ্টা করল ওরা কী বলেছিল। ওর পরিষ্কার মনে পড়ছে লিসা আজ রাতে পার্টির

কথা বলেছিল আর এলিয়ট বলেছিল হিলার চলে না যাওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে।

ঘরের মোমের মূর্তিগুলোর উপরে আলো ফেলল মার্ক। বীভৎস মুখগুলো দেখছে, এক স্বর্ণকেশী সুন্দরী মহিলার চেহারায় স্থির হলো ফ্ল্যাশলাইট। এক সেকেন্ডের জন্য মনে হলো ওটা লিসা। মোমের মুখখানার একই রকম টলটলে বাদামী চোখ আর লাল টকটকে অধর। তবে ঠোঁটের উপরে চারটে সাদা কাটা দাগ। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় মুখখানা ভীষণ জ্যান্ত মনে হলো, যেন ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ঠোঁট বেঁকে গেছে বিদ্রূপাত্মক হাসির ভঙ্গিতে। ভয়ানক চমকে গেল মার্ক। আলো সরিয়ে নিল ভৌতিক মুখখানার উপর থেকে, লাইব্রেরির দরজা দিয়ে এক ছুটে ঢুকে পড়ল ডাইনিংরুমে।

'এলিয়ট! লিসা!' কাঁপা গলায় ডাকল সে। কোনও জবাব নেই। আছে শুধু খালি পিশাচ বাড়ির গভীর নীরবতা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখা গেল ডাইনিং টেবিলে বসে খাচ্ছে কয়েকজন। হাঁ হয়ে আছে মুখ, বিষাক্ত খাবার খাওয়ার যন্ত্রণায় অস্থির। ছুটতে শুরু করল মার্ক, দ্রুত থেকে দ্রুততর হলো গতি, দোতলার বেডরুমে চলে এল। এখানেও শুধু মৃত্যু আর হত্যার বিকট দৃশ্য। একেকটি ঘরের দরজা খুলছে মার্ক ক্ষীণ আশা নিয়ে, ওকে পার্টির কোন গাইড উল্লসিত অভ্যর্থনা জানাবে। কিন্তু প্রতিটি ঘর খালি। এখন শুধু নীচতলার জেলখানাটা দেখা বাকি।

নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল মার্ক, প্রতি পদক্ষেপে পুরানো কাঠের তক্তা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে আপত্তি জানাল। শেষ আশা জেলখানার দরজার সামনে চলে এল মার্ক। কিন্তু দরজা খুলতে শুধু নিকষ আঁধার ওকে ভেংচি কাটল।

প্রচণ্ড রাগে শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটছে মার্কের। ওকে আচ্ছা বুদ্ধু বানিয়েছে এলিয়ট এবং লিসা। আজ রাতে পার্টি-ফার্টি–কিচ্ছু নেই। ওকে পিশাচ বাড়িতে একা ফেলে রেখে যাবার বুদ্ধি করেছিল ওরা। পরিকল্পনা সফল হয়েছে। এ মুহূর্তে হয়তো এক সাথেই রয়েছে দু'জনে, মার্কের বোকা বনে যাবার কথা ভেবে হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে। লাল কার্পেট বিছানো রাস্তায় আলো ফেলল মার্ক। সোজা জেলখানার দিকে চলে গেছে। ওর দু'পাশে নির্যাতিত লাশের সারি। ওদিকে তাকাল না মার্ক। সে শুধু বাইরে যাবার দরজাটা খুঁজছে। এখান থেকে যত দ্রুত বেরিয়ে পড়া যায় ততই মঙ্গল।

কার্পেট বিছানো রাস্তার শেষ মাথায় চলে এল মার্ক, কতগুলো লাল পর্দার সামনে এসে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে রাস্তা। একটানে পর্দা সরিয়ে ফেলল মার্ক। পর্দার পেছনে একটা দরজা। এ দরজা খুলে পিশাচ বাড়ির বাইরে যাওয়া যায়। জোরে দরজায় ধাক্কা দিল মার্ক। একটুও নড়ল না দরজা। দমাদম ঘুসি মারল, কাঁধ দিয়ে ঠেলা দিল। কোনও লাভ হলো না। বন্ধই রইল দরজা। অবশেষে ভয়ঙ্কর সত্যটা উপলব্ধি করতে পারল মার্ক আজ রাতের মত সে বন্দি পিশাচ বাড়িতে।

আবার দরজায় ঘুসি মারল মার্ক। ব্যথার চোটে আর্তচিৎকার ছাড়ল। নানা

দুশ্চিন্তা কালো বাদুড়ের মত ডানা ঝাপটাতে লাগল মস্তিষ্কে। পিশাচ বাড়ির কোন ঘরে সে রাতটা কাটাবে বুঝতে পারছে না। একেকটা ঘরের কথা মনে পড়ে আর শিউরে ওঠে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘর হলো এই জেলখানা। খুন হয়ে যাবার ভয়ে ভীত প্রাণীর মত সে জেলখানার কার্পেট মোড়ানো রাস্তা দিয়ে পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি বেয়ে বেডরুমে যাবে।

মাঝামাঝি পথ পেরিয়েছে মার্ক, আঁধার ভেদ করে ওর সামনে একটা শব্দ হলো। ভয়ে হিম হয়ে গেল গা। কান খাড়া করল মার্ক। দ্বিতীয়বার শব্দটা শুনতে পেল। ইঁদুর টিঁদুর হবে হয়তো, নিজেকে সান্ত্বনা দিল মার্ক, কিন্তু মস্তিষ্কের একটা অংশ এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হলো না। কোন মানুষ করেছে শব্দটা, পায়ের আওয়াজের মত, অন্ধকারে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

ছুটল মার্ক, ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলছে ডানে-বামে, চকিতে তাকাচ্ছে মোমের বিকট মূর্তিগুলোর দিকে। একটা মূর্তি দেখে চমকে গেল–এক স্বর্ণকেশী সুন্দরী, গাঢ় বাদামী চোখ, লাল টকটকে অধর। জেলখানায় এ মূর্তি আগে দেখেনি ও। এটাকে না সে কয়েক মিনিট আগে লাইব্রেরিতে দেখে এসেছে?

সিঁড়ি গোড়ায় পৌঁছে গেছে মার্ক, কাঁপা পায়ে কয়েক কদম ওঠার পড়ে হোঁচট খেল। মাথাটা দারুণ জোরে বাড়ি খেল এক জল্লাদের লোহার মূর্তির সাথে। সিঁড়িতে কয়েক মুহূর্ত চিৎ হয়ে পড়ে রইল মার্ক, নড়াচড়ার শক্তি নেই। বোঁ বোঁ ঘুরছে মাথা। এমন সময় পায়ের শব্দ আবার শুনতে পেল ও। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে।

হাচড়ে-পাচড়ে হাঁটু মুড়ে বসল মার্ক, পাগলের মত খুঁজছে ফ্ল্যাশলাইট। পড়ে যাবার সময় কোথাও ছিটকে গেছে ওটা, আলোও নিভে গেছে। অন্ধকারে খামোকাই হাতড়ে বেড়াল মার্ক।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ ক্রমে কাছিয়ে আসছে। মার্ক টলতে টলতে সিধে হলো, দৌড়াল দোতলার ঘরগুলোর দিকে। হলওয়ের শেষ মাথায়, দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, হাঁপাচ্ছে বেদম। মখমলের মত ঘন অন্ধকার আর কবরের মত নিস্তব্ধ। ধীরে ধীরে শ্বাস নিয়মিত হয়ে এল মার্কের। কল্পনা, মনকে বোঝাল ও, আসলে সে এতক্ষণ কল্পনা করেছে। কোথাও কেউ নেই তো! আর ঠিক তখন দোতলার হলওয়েতে প্রতিধ্বনি তুলল পায়ের আওয়াজ। মার্ককে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে, ধীরে এবং উদ্দেশ্য নিয়ে, আঁধার ভেদ করে।

গলা দিয়ে উঠে আসা চিৎকারটাকে গিলে ফেলল মার্ক, সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ের গতিতে নামতে শুরু করল, যাচ্ছে ডাইনিংরূমের দিকে। পায়ের শব্দটা দ্রুত হলো। অনুসরণকারীও এবার ছুটছে। প্যাসেজে মোড় নিতে ভুলে গিয়েছিল মার্ক, প্রচণ্ড বাড়ি খেল তামার রেইলিং-এ। ব্যথায় ফুসফুসের সমস্ত বাতাস যেন বেরিয়ে গেল, ওর গলা থেকে বেরিয়ে আসা আর্তনাদ বিশাল, শূন্য ঘরে প্রতিধ্বনি তুলল। টলমল পায়ে পিছিয়ে এল মার্ক, চোখে সর্ষেফুল দেখছে। এমন সময় হাসির শব্দটা শুনতে পেল–নিচু গলায়, খনখনে ভৌতিক হাসি–বেরিয়ে এল আঁধার ফুঁড়ে।

আতঙ্কের স্রোত ওকে অবশ করে ফেলছে, তবু দরজার দিকে ছুটল সে। এ দরজা ডাইনিংরুমকে আলাদা করে ফেলেছে লাইব্রেরি থেকে। এক ধাক্কায় দরজা খুলে লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়ল মার্ক, গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, 'লিসা!'

কণ্ঠটি ওকে ব্যঙ্গ করতেই যেন ফিরে এল প্রতিধ্বনি হয়ে। সিটিংরুমের দরজার দিকে অনুমান করে ছুটল মার্ক, কিন্তু ওখানে পৌঁছুবার আগেই লাইব্রেরিতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে। অটল ও অশুভ পায়ের আওয়াজ, ওকে খুঁজছে অন্ধকারে। দরজার পাল্লা হাতড়াচ্ছে মার্ক, ঘাড়ের কাছে ফোঁস করে তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলল কেউ। তারপর, পেছনে, অন্ধকারে, ঘরঘরে গলার হাসি শোনা গেল। মুখ হাঁ করেছে মার্ক, চিৎকার দেবে, ধারাল কিছু একটা বিদ্যুৎ বেগে ঢুকে গেল ওর ঘাড়ে, দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল মার্ক পিশাচ বাড়ির আরেক শিকার হয়ে।

পরদিন বিকেলে লিসা লাইব্রেরি ঘরে ঢুকল রুটিন কাজটা করতে। মার্ক কখন আসবে, তর সইছে না ওর। কাল রাতে ছেলেটা কী রকম ভয় পেয়েছে জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে সে। লাইব্রেরির মোমের মূর্তিগুলোর গায়ে টর্চের আলো ফেলল লিসা। লক্ষ করল স্বর্ণকেশী মহিলা তার আগের জায়গায় নেই, মেঝেতে একটা শরীরের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এক মুহূর্তের জন্য দম বন্ধ হয়ে এল লিসার। সে নিশ্চিত ওখানে এর আগে কেউ ছিল না।

সামনে পা বাড়াল লিসা, ঝুঁকল। স্বর্ণকেশীকে ঠেলে সরিয়ে দিল। মোমের একটা মূর্তি। এক তরুণের। মুখটা আতঙ্কে বিকৃত। লিসা ভয়ে চিৎকার দিতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। চেহারাটা অবিকল মার্কের মত। হাত বাড়াল লিসা। ছুঁলো মুখখানা। ঠাণ্ডা মোমের স্পর্শ পেল হাতে।

পুতুল

লোকটা সূর্য ওঠার পরপর বেরিয়ে পড়েছে, এখন পাহাড়ের নীচের বালুর সরু রাস্তাটা ধরে হাঁটছে। আবর্জনার কথা বাদ দিলে জায়গাটা হাঁটাহাঁটির জন্য বেশ ভাল। পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় ড্রাইভাররা ফাস্টফুডের আঠালো ব্যাগগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় নীচের ভাঙা বীচ চেয়ার লক্ষ্য করে। ওদিকে নজর দেয় না লোকটা, তবে আজ সকালে দুটো মস্ত বোল্ডারের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটাতে তার চোখ আটকে গেল। কৌতূহল বোধ করার কারণ আবর্জনা থেকে আলাদা জিনিসটা। সে হেঁটে গেল ওখানে। হাতে তুলে নিল ওটা। ঘষা খেয়ে চামড়া ছিলে গেছে সামান্য, নীচের দিকটাতে বড়সড় একটা ফাটল। তবে পাহাড়চুড়ো থেকে ফেলে দেওয়া সত্ত্বেও এটা ভেঙে টুকরো হয়ে যায়নি, সেটাই

আশ্চর্য। ল্যাচের উপরে আঙুল বোলাল সে, শক্ত ভাবে বন্ধ। তা ছাড়া হিমে তার হাতও খানিকটা অসাড়। সমতল একটা পাথরের উপরে বসল সে, ফুঁ দিতে লাগল আঙুলে। হাত গরম হলে আবার চেষ্টা চালাবে সে।

মাস তিনেক আগের ঘটনা। পাহাড়ি রাস্তাটা থেকে মাইল কয়েক দূরে ষোড়শী অ্যাবি রজার্স তার পরিবারের সঙ্গে নিজেদের নতুন বাড়িতে যাচ্ছিল। অবশ্য বাড়িটি নতুন নয় একেবারেই। অ্যাবির মা ডিয়ানার মতে, এ বাড়ি ১৮৭০ সালের তৈরি, তবে সংস্কার করা হয়েছে বহুবার।

'প্রাগৈতিহাসিক বাড়ির মত লাগছে,' ঘোঁতঘোঁত করল লিন্ডসে। অ্যাবির একমাত্র ছোট বোন সে, বয়স দশ। যে কোন পুরানো জিনিসই তার কাছে 'ডিসগাস্টিং', কোন কিছু মনঃপূত না হলে এ শব্দটাই সে ব্যবহার করে।

'আগের বাড়িটাই ভাল ছিল। কী অসাধারণ সুইমিংপুল!'

'আর ও বাড়ির খরচও ছিল অসাধারণ,' বললেন ডিয়ানা। একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স ঠকাশ করে নামিয়ে রাখলেন সামনের ছোট বারান্দায়, আঙুল দিয়ে চোখের উপরে পড়া চুল ঠেলে সরালেন।

'আগের বাড়িতে গাছপালার খুব অভাব ছিল,' বলল অ্যাবি। 'এখানে তা নেই। বাড়ির পেছনের ওই জঙ্গলে তুই গাছ-বাড়ি বানিয়ে নিতে পারবি, লিন্ডসে।'

লিন্ডসের চেহারা থেকে বিরক্তির ভাবটা চলে গেল।

'গুড আইডিয়া,' মন্তব্য করলেন ওদের মা। তালায় চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিলেন। খুলে গেল সদর দরজা। 'জায়গাটা সুন্দর, না? এ বাড়িতে আজ আমাদের প্রথম রাত।'

কোথাও যাবার ব্যাপারে কোন রকম উৎসাহ নেই অ্যাবির। বাবার সাথে মা'র ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বছর চারেক আগে, ও বাড়ির সুদের হার দিন দিন বেড়ে চলছিল। মা'র পক্ষে প্রতি মাসে অতগুলো টাকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তাই পুরানো বাড়িটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় ওরা। অবশ্য তাই বলে শহরের বাইরে চলে যায়নি তারা, নিজেকে মনে করিয়ে দিল অ্যাবি। আগের স্কুলেই যাবে ও, সেখানে পুরানো বন্ধু-বান্ধবরাই থাকছে। এ বছর মার্ক হেলপার্ন হয়তো ওকে প্রেম নিবেদন করে বসতেও পারে।

তবু, পুরানো পড়শীকে ছেড়ে আসতে খারাপই লাগছিল অ্যাবির। তবে নতুন বাড়িটি দেখার পরে ওটার প্রেমে পড়ে যায় সে। অথচ ওটা শতাব্দী প্রাচীন একটি বাড়ি। উঠোন ভর্তি আগাছা। আর বাড়ির ঢালু ছাদ এবং লম্বা পুরানো জানালাগুলোর মধ্যে কী যেন একটা আছে। অ্যাবির মনে হয়েছে বাড়িটা ওকে হাত বাড়িয়ে ধরতে আসছে।

তারপরও বাড়িটি কেন যে ভাল লেগে গেছে অ্যাবি নিজেই জানে না।

প্রথমবার এ বাড়ি দেখার পরে এখানে চলে আসার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুণছিল সে।

প্রথম রাতে, ডিনার শেষে, ডিয়ানা একটা কাগজের ব্যাগ হাত দিয়ে চেপে সমান করে তাতে লিস্ট লিখতে বসে গেলেন। লিখলেন জানালাগুলো সারাতে হবে, রঙ করতে হবে প্রতিটি ঘর, রান্নাঘরে পর্দা টাঙানো দরকার, চিলেকোঠার ঘরও পরিষ্কার করতে হবে।

'আমি চিলেকোঠার ঘর পরিষ্কার করব,' কিছু না ভেবেই বলল অ্যাবি।

'সত্যি করবি?' কৌতূহল নিয়ে মা তাকালেন মেয়ের দিকে। 'ওখানে গেলে তো গরমে সেদ্ধ হয়ে যাবি। ও ঘরে জানালা টানালা কিচ্ছু নেই। তোর না গন্ধঅলা, বন্ধ ঘর একেবারেই সহ্য হয় না?'

'তবু আমি কাজটা করব,' বলল অ্যাবি। মার অবাক হবার সঙ্গত কারণ রয়েছে। ছোট, আলো-বাতাসহীন ঘর, এলিভেটর, ক্লজিট ইত্যাদি আতঙ্কিত করে তোলে অ্যাবিকে। কিন্তু চিলেকোঠার ঘর এমন টানছে ওকে, দেখার তর সইছে না।

পরদিন সকালে, মা কাজে যাবার কিছুক্ষণ পরে, অ্যাবি ওর ঝলমলে সোনালি চুল বেঁধে ফেলল একটা রুমাল দিয়ে, দোতলার ঘরের মই নিয়ে এল। ধাপ বাইতে শুরু করল। মা প্রচণ্ড গরম লাগবে বলেছিল। কিন্তু অ্যাবি কানে তোলেনি কথাটা। চিলেকোঠা এত গরম কল্পনাও করেনি সে। তাপটা যেন জ্যান্ত, ঘন আর ভারী, যেন একটা হাত চেপে ধরছে ওকে, বন্ধ করে দিচ্ছে দম, মাথা ঘুরতে লাগল। চিমনির ইটের গায়ে হেলান দিল অ্যাবি, চোখ বুজল। মুখ ভরে গেছে ঘামে, ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে শুরু করেছে গাল বেয়ে। হাত দিয়ে কপাল মুছল অ্যাবি, ধীরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করল। বাইরে থেকে ভেসে এল হাতুড়ির অস্পষ্ট ধাতব আওয়াজ–লিন্ডসে তার 'গাছ-বাড়ি' নিয়ে ব্যস্ত। পাখির কিচিরমিচিরও শোনা যাচ্ছে, মাঝেমধ্যে হুশ্‌ করে চলে যাওয়া দু'একটা গাড়ির শব্দ। কয়েক সেকেন্ড পরে চোখ মেলল অ্যাবি।

ছাদ যেখানে মেঝের সঙ্গে মিশেছে, সূর্যের আলোর ফালি ঢুকছে ওখান থেকে। মাকড়সার জাল নাচছে বাতাসে। ছাদের মাঝখানে ঝুলছে একটা নগ্ন বাল্‌ব। ওটার লম্বা রশিটা অ্যাবির নাগালের মধ্যে, হাত বাড়ালেই ধরা যায়। রশি ধরে টান দিল অ্যাবি, মৃদু আলো জ্বলে উঠল, যদিও ঘরের দূরবর্তী কোণগুলোতে ছায়া থেকেই গেল।

তীব্র উত্তাপ, বন্ধ ঘর, মাকড়সার ভয়–এর যে কোন একটি কারণই অ্যাবির এখান থেকে ছুটে পালানোর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ওর জন্য কিছু একটা অপেক্ষা করছে এখানে। ওটার উপস্থিতি টের পাচ্ছে অ্যাবি, উপলব্ধি করতে পারছে গুমোট ছায়ার মাঝে ওটা আছে।

অদ্ভুত এক ব্যাকুলতায় অ্যাবি এগিয়ে গেল স্তূপ করা ভাঙা কার্ডবোর্ডের বাক্স, কাগজের ব্যাগ আর ভাঁজ করা ছেঁড়াখোঁড়া কম্বলের আবর্জনার দিকে। ওর জন্য কী অপেক্ষা করছে দেখবে। এক ঘণ্টা পাগলের মত আবর্জনা ঘাঁটল সে, কালি ঝুলিতে কালো হয়ে গেল হাত, জামা-টামা ধুলোয় নোংরা।

অবশেষে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল সে।

একটা কাগজের ব্যাগ থেকে ওটাকে বের করে আনল অ্যাবি। ব্যাগটা অনেক পুরানো। ফরফর করে ছিঁড়ে গেল। ওর হাতে চারকোনা একটা কাঠের বাক্স, ঘন ধুলোর আস্তরণ তাতে। কাগজ দিয়ে ধুলো পরিষ্কার করল অ্যাবি। বাক্সটা দেখতে বেশ সুন্দর, নরম কাঠ দিয়ে তৈরি, পিতলের ছিটকিনিটা চকচক করছে। অ্যাবির মনে হলো বাক্সটার মোটা কাঠ ভেদ করে একটা শক্তি বেরিয়ে আসতে চাইছে, ঢুকে যাচ্ছে ওর হাতে। কেঁপে উঠল অ্যাবি। দ্রুত ছিটকিনি খুলে ফেলল, তুলল ঢাকনি।

বাক্সের ভিতরে একটা পুতুল।

সাদা সাটিনের পোশাকটা অনেক দিন আগের বলে হলুদ রং ধরেছে, পুতুলটা মৃত একটা বাচ্চার মত শুয়ে আছে। মাথায় চুড়ো করে বাঁধা কালো চুল, পরনের জামাটা একশো বছর আগের ডিজাইনের। স্কার্ট লম্বা, কোমরের কাছটাতে চেপে বসেছে, উঁচু গলা ও লম্বা স্লীভে লেস বসানো।

চীনা মাটির মুখ, আকাশ নীল চোখজোড়া অ্যাবির মত, পাপড়ি কালো, চেয়ে আছে।

আকাশ-নীল চোখজোড়া এত জীবন্ত, চাউনির মধ্যে শক্তিশালী ও ভীতিকর এমন একটা ব্যাপার আছে, আঁতকে উঠল অ্যাবি।

মুহূর্তের জন্য মনে হলো ও চোখে ঠিকরে পড়ছে ঘৃণা। তবে তা একমুহূর্তের জন্যই। অ্যাবি বাক্স থেকে তুলে নিল পুতুলটাকে। ওটার চোখজোড়া এখন ফাঁকা ও নিষ্প্রাণ। কাঁচের নীল চোখ দম বন্ধ করা চিলেকোঠার নগ্ন বালবের ম্লান আলোয় ঝিলিক দিল।

চিলেকোঠার ঘরটি অর্ধেক পরিষ্কার করল অ্যাবি। তারপর পুতুলটাকে নিয়ে চলে এল নিজের ঘরে। সাটিনের স্কার্ট দিয়ে চেপে মোটামুটি ঠিকঠাক করে শেলফের লম্বা তাকে, স্টাফ করা কতগুলো প্রাণীর সাথে রেখে দিল। এগুলো গত বছর ওর বাবা মেক্সিকো থেকে পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে পুতুলও আছে, রয়েছে আর্ট ক্লাসে নিজের হাতে তৈরি একজোড়া মাটির পাত্র এবং সাগর সৈকত থেকে কুড়িয়ে আনা কতগুলো খোলা। তাকে পুতুলটা বসে রইল রানির মত, উদ্ধত এবং শীতল, মুখ ফেরানো অ্যাবির বিছানার দিকে।

'এটাকে কেন যে তোমার মনে ধরল বুঝতে পারছি না,' সে রাতে লিন্ডসে বলল তার বড় বোনকে। 'পুতুলটা খুবই পুরানো আর ডিসগাস্টিং।'

'তোর কাছে ডিসগাস্টিং মনে হলেও আমার কিছু এসে যায় না,' বলল অ্যাবি। বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে আছে পুতুলটার দিকে। 'তবে পুতুলটা দেখতে খুব সুন্দর। মা বলেছে এটা বোধহয় কোন দামী অ্যান্টিক।'

'তা হলে বিক্রি করে দিলেই পারো। আমি হলে করতাম।'

'আমি জানি তুই তা করতি।' বলল অ্যাবি। 'কিন্তু আমার বিক্রি করার ইচ্ছে নেই। ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা কর, লিন্ডসে—আমি ওকে মুক্ত করে দিয়েছি। ও

এখন স্বাধীন নারী।'

'হুহ্,' নাক দিয়ে বিদঘুটে শব্দ করল লিন্ডসে।

'যা। এখন ভাগ।' বলল অ্যাবি। 'আমার ঘুম আসছে। ঘুমাব।'

লিন্ডসে তার ঘরে চলে যাবার পরে বেডসাইড বাতিটা সুইচ টিপে নিভিয়ে দিল অ্যাবি। পা টান টান করে শুলো। স্ট্রীট ল্যাম্পের আলো ভেদ করেছে পাতলা, সাদা পর্দা, অ্যাবি দেখতে পেল আঁধারেও জ্বলজ্বল করছে পুতুলটার চোখ। এ চোখ বোধহয় কখনও বন্ধ হয় না। মা বলেছে পুতুলটাকে সম্ভবত এভাবেই তৈরি করা হয়েছে, সারাক্ষণ খোলা থাকবে চোখ। পুতুলটার মাথাটা খুলে ভিতরের কলকজা দেখা যায়। তবে শরীর এত নরম, ভেঙে যেতে পারে ঘাড়। অ্যাবি অমন ঝুঁকি কখনোই নেবে না। সে চমৎকার একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছে। বেহুদা ঘাঁটাঘাঁটি করে ওটাকে নষ্ট করবে না। পুতুলটার অদ্ভুত, স্থির চোখের চাউনির সাথে একসময় সে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

হপ্তাখানেক পরে শুরু হলো স্কুল, সেই সাথে অ্যাবির স্বপ্নেরও। ওর জীবনটাকে বদলে দেবে স্কুল, ভেবেছিল অ্যাবি। নতুন বাড়ি, নতুন ঘর, নতুন ক্লাস। কিন্তু অ্যাবি যখন স্বপ্ন দেখার আসল কারণ জানতে পারল ততদিনে দেরি হয়ে গেছে অনেক।

স্বপ্নের কথা ভুলে থাকতে চাইল অ্যাবি, কিন্তু ওগুলো তার মস্তিষ্কে সেঁটে থাকল আঠার মত, দিনগুলোকে কালো মেঘের ছায়া দিয়ে ঘিরে রাখল, তাকে জাগিয়ে রাখল অনেক রাত অবধি, অ্যাবি পুতুলের পলকহীন চোখে চেয়ে জেগে থাকল।

স্বপ্নগুলো বড় অদ্ভুত, ছোট ছোট অর্থহীন দৃশ্যপট নিয়ে তৈরি। তবে তা আতঙ্কিত করে তুলল অ্যাবিকে। ঘুমের মধ্যে সে গোঙায়, মোচড় খেতে থাকে শরীর। তবে ঘুম ভাঙার পরে যা ঘটত তা ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। আয়নায় নিজের চেহারা চেনা যায় না। যেন অন্য কেউ তাকিয়ে আছে তার দিকে। অ্যাবি প্রতি রাতে বিপদের স্বপ্ন দেখে আর তা ঠেকানোর ক্ষমতা তার নেই।

প্রথম শিকার হলো ওর বন্ধু ইরিন গ্রে।

সেদিন শুক্রবার রাত, স্কুলের প্রথম হপ্তার শেষ দিন। ইরিনকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল অ্যাবি। তারপর অ্যাবির বাসায় থেকে গেছে ইরিন। ঘুমাবার আগে রাত একটার দিকে, ইরিন অ্যাবিকে বোঝাতে চাইছিল মার্ক হেলপার্নের সঙ্গে অ্যাবির ঠিক খাপ খাবে না।

'আমি জানি ও ভদ্র ছেলে,' স্লীপিং ব্যাগ থেকে মাথা বের করে বলল ইরিন। 'তবে কারও সঙ্গে ওর সম্পর্ক টেকে না। প্রতি হপ্তায় নতুন কোন মেয়ের সাথে দেখা যায় তাকে।'

'আমি কিন্তু ওকে বিয়ে করছি না, ইরিন,' বলল অ্যাবি। 'আমি তো ওর সঙ্গে শুধু ডেট করব।'

'ওহ্, অ্যাবি,' ব্যাগ খুলে সিধে হলো ইরিন, হেঁটে গেল শেলফের কাছে। তাক থেকে পুতুলটাকে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে হাতের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'ও তোমাকে ছেড়ে দিলে কিন্তু অনেক কষ্ট পাবে।' পুতুলটাকে এবারে লোফালুফি করছে সে। 'এটার সমস্যা কি? চোখ বোজে না।'

'ও একটা পুতুল, "এটা" নয়। আর কেন চোখ বোজে না জানি না।' বলল অ্যাবি,' যাক, তুমি মার্কের কথা বলছিলে।'

'আমি চাই না তুমি ছ্যাঁকা খাও, ঠিক আছে?' ইরিন দেরাজের তাকে তুলে রাখল পুতুলটাকে, ঢুকে পড়ল স্লীপিং ব্যাগে। 'আর তুমি ছ্যাঁকা খেয়েছ এ কথা শুনতেও চাই না।'

হেসে উঠল অ্যাবি, নিভিয়ে দিল বাতি। কিছুক্ষণ পরে ইরিনের নিদ্রাতুর গলা ভেসে এল, 'অ্যাবি?'

'উ?'

'পুতুলটার চোখ দেখলে ভয় লাগে। কেমন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। ওটার মুখ আরেক দিকে ঘুরিয়ে দিই?'

'দাও।' অ্যাবি ঘুম ঘুম চোখে দেখল ইরিন হেঁটে গেল ঘরের কোণে, আঁধারে তার লম্বা, সাদা টি-শার্ট ঝাপসা লাগছে। ইরিন যখন ফিরে এল, অ্যাবির ততক্ষণে চোখ লেগে গেছে। এক সেকেন্ডের জন্য আবার জেগে উঠল সে ঝাঁকি খেয়ে, পিঠে বরফঠাণ্ডা কীসের যেন স্পর্শ পেয়েছে। এতই ঠাণ্ডা, উষ্ণ ঘরের মধ্যেও শিউরে উঠল সে। পরমুহূর্তে শীতল স্পর্শটা আর রইল না, গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল অ্যাবি।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল সে। একটা হাত। ছোট, ফ্যাকাসে রঙের হাতটা। হলঘরে। অ্যাবি জানে না, দেখতেও পাচ্ছে না ওটা কী করছে। তবে জানে ওটা তার রুমের বাইরে, হলঘরে রয়েছে। হলঘরটাকে সে চিনতে পারছে কারণ দেয়ালের লতানো প্যাটার্নের ওয়াল পেপার আগের জায়গাতেই রয়ে গেছে, রং করা বেস বোর্ডও সে দেখতে পাচ্ছে। মা বলেছে ওখানে আসল কাঠ লাগিয়ে দেবে।

হাতটা রোগাটে, তবে চমৎকার গঠন। মেয়েলি হাত। ফ্যাকাসে রঙের একটা প্রজাপতির মত মেঝের উপর ওটা উড়তে লাগল, সিঁড়ির মাথায় ভেসে রইল এক মুহূর্ত, তারপর মিশে গেল আঁধারে।

একটা চিৎকার শুনে জেগে গেল অ্যাবি।

ঘর অন্ধকার তবে হলঘর থেকে এক ফালি রূপোলি আলো ঢুকে পড়েছে দরজার চৌকাঠ গলে। ওখান থেকে অস্পষ্ট গলা ভেসে আসছে। ইরিন কথা বলছে অ্যাবির মা'র সঙ্গে। বিছানা থেকে নেমে পড়ল অ্যাবি, পা বাড়াল দরজার দিকে।

'আমি একটুর জন্যে বেঁচে গেছি,' শুনতে পেল ইরিন বলছে।

'কী হয়েছে?' হলঘরের আলোতে চোখ পিটপিট করল অ্যাবি।

'তুমি ঠিক আছ তো? তোমার চিৎকার শুনলাম যেন।'

'ঘাড় ভাঙার মত দশা হলে তুমিও চিৎকার দিতে,' বলল ইরিন। 'খুব পিপাসা লেগেছিল আমার। নীচে যাচ্ছিলাম। কীসের সঙ্গে যেন পা বেধে যায় আমার।' ঝুঁকে হাত দিয়ে হাঁটু ডলল ইরিন। 'আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই।'

'কীসের সঙ্গে পা বাধল তোমার?' উপরের সিঁড়িতে চোখ বুলালেন অ্যাবির মা। 'এখানে তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'জানি না আমি,' কপালে ভাঁজ পড়ল ইরিনের। 'কিন্তু কিছু একটা ছিল ওখানে। পরিষ্কার টের পেয়েছি।'

সিঁড়ির মাথায় চোখ বুলাল তিনজন, তারপর পরস্পরের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। অ্যাবির স্মৃতির কুঠুরিতে কিছু একটা খোঁচা দিচ্ছিল, কোন একটা ছবি, কিন্তু মনে করতে পারছে না সে। শেষে যে'যার বিছানায় ফিরে গেল ওরা।

'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি,' স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে বলল ইরিন। 'ভাগ্যিস ডিগবাজি খাইনি। তোমাদের সিঁড়িগুলো যা খাড়া!'

'হুঁ,' বলল অ্যাবি। 'তোমার কিছু হয়নি দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করছি,' বিছানায় শুয়ে চোখ বুজল সে। ইরিন উঠে বসেছে টের পেয়ে চোখ মেলে চাইল। 'কী করছ তুমি?'

'পুতুলটার মুখ ঘুরিয়ে রাখছি,' জবাব এল।

'একবার না ঘুরিয়ে রাখলে!'

'রেখেছিলাম তো! ওটা বোধহয় আবার ঘুরে গেছে। কেমন প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।'

পরদিন, ইরিন চলে যাবার পরে স্বপ্নের কথা মনে পড়ল অ্যাবির। ফ্যাকাসে হাতখানা উড়ছিল, প্রায় ভেসে ছিল সিঁড়ির মাথায়, ঠিক যেখান থেকে পড়ে যায় ইরিন। হাতটা কি ওকে ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করছিল যে ওখানে কিছু একটা ঘটবে?

দিন সাতেক বাদের ঘটনা। অ্যাবি, ইরিন ও তাদের বান্ধবী হলি রোসেল অ্যাবিদের রান্নাঘরে বসে পড়াশোনা করছে। ওদের পড়ার বিষয় সমাজ বিজ্ঞান। অ্যাবির ঘরে বসে পড়ার চেষ্টা করেছিল হলি। তবে ইরিনের মত তারও পুতুলটার চাউনি ভাল লাগেনি।

'ভয়ঙ্কর চোখ,' শিউরে উঠেছিল হলি। 'যেন সারাক্ষণ লক্ষ করছে আমাকে।' তারপর বইখাতা নিয়ে চলে এসেছে কিচেনে।

'রচনা লেখার পরীক্ষায় আমি কখনোই ভাল করতে পারি না,' অনুযোগ হলির কণ্ঠে। 'প্রশ্নের ধরন কী হবে না জেনে বেহুদা পড়ার কোন মানে হয়?'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল ইরিন, ফ্রিজ খুলে সোডার বোতল বের করছে। অ্যাবি তার পাশে কাউন্টারে দাঁড়ানো, বাটিতে পপকর্ন ঢালছে।

হলির কনুই টেবিলে ঠেস দেওয়া, চিবুকে হাত। তার ঠিক মাথার উপর

ঝুলছে বৈদ্যুতিক বাতি। আলো পড়ে ঝলমল করছে কালো চুল। অ্যাবি কী যেন বলার জন্য ওর দিকে ঘুরল আর তখন ঘটে গেল ঘটনাটা।

সাবধান করে দেওয়ার সময় পাওয়া গেল না। টেবিলের উপরে চেইন দিয়ে ঝুলছিল কাঁচের বাতি, খসে পড়ল হলির মাথার উপরে, কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো বিস্ফোরণের মত।

রক্তে ভেসে গেল হলির মুখ। ইরিন দ্রুত ওর মুখের রক্ত মুছতে লাগল, তারপর ছুটে গেল অ্যাবির মা'র কাছে। বাতিটা খসে পড়ার মুহূর্তে চিৎকার করে উঠেছিল অ্যাবি, তারপর চুপ হয়ে গেছে। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত আতঙ্ক নিয়ে দেখল তার মা হলিকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। বলছেন ভয় পাবার কারণ নেই। অতটা মারাত্মক নয় ক্ষত। দেখল মা আর ইরিন মিলে হলিকে সিধে হতে সাহায্য করছে, মা বলছেন তিনি হলিকে তার বাসায় পৌঁছে দেবেন। এসব দেখছে অ্যাবি, একই সাথে একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

কাঁচের বাতিটা বনবন করে ঘুরছিল, এত জোরে ঘুরছিল যে রঙিন গ্লাস প্যানেল আলোর অদ্ভুত একটা ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করে ফেলেছিল টেবিলের উপরে। অ্যাবি দেখছিল ঝর্ণাধারাটার পাক খাওয়ার গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠছে, ওর চোখ এমন ধাঁধিয়ে যায়, অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য হয়। তারপর সে শব্দটা শোনে। ফোঁস করে শ্বাস ফেলেছিল কেউ। শব্দটা বাতির কাছ থেকে শোনা গিয়েছিল। অ্যাবি ঘুরে তাকায়, একটা হাত দেখতে পায় সে। ফ্যাকাসে সাদা, নরম হাত। এগিয়ে যাচ্ছিল বাতির দিকে। আঙুলের মৃদু স্পর্শে বাতির ঘোরা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আরেকটা শব্দ শুনতে পায় অ্যাবি। দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। হাতটার মতই নরম এবং কোমল। তৃপ্তির নিঃশ্বাস।

এ দৃশ্যটা অ্যাবি গত রাতে স্বপ্নে দেখেছিল। এখন মেঝেতে ছড়ানো ছিটানো হলির রক্তের ছিটে মাখানো বই-খাতার দিকে তাকিয়ে সে শিউরে উঠল। বুজে ফেলল চোখ। তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল স্বপ্নের মাঝে। কিন্তু ঠিক সময়ে স্বপ্নের কথা মনে পড়েনি অ্যাবির, বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি বান্ধবীকে।

মাথায় চারটা সেলাই পড়ল হলির। এ ছাড়া সে ঠিকই আছে। তবে এ ঘটনা বা স্বপ্নের কথা কোনটাই মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না অ্যাবি।

তারপর থেকে ঘুম হারাম হয়ে গেল অ্যাবির। রাতের বেলা দু'চোখ এক করতে ভয় পায় সে। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে না জানি আবার কোন্ দুঃস্বপ্ন দেখে। দুঃস্বপ্নগুলো তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল ওকে।

কিন্তু অ্যাবিকে তো ঘুমাতে হবে। আর ঘুমাবার পরে যথারীতি স্বপ্ন দেখল সে। আর সে স্বপ্নের পরিণতি হলো আগের চেয়েও ভয়ঙ্কর। আসলে স্বপ্ন নয়, বাস্তব। বিভীষিকাময় বাস্তবতা এটাই যে ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যায় যে বাধা দেওয়ার সময় থাকে না। একরাতে সে মা'র চিৎকার শুনে ঘুম থেকে জেগে গেল। মা কর্কশ

গলায় চেঁচাচ্ছেন, অ্যাবিকে ডাকছেন সাহায্য করার জন্য।

অ্যাবি অজানা আশঙ্কায় কাঁপতে কাঁপতে ছুটল। দেখল মা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছেন। নগ্ন পায়ে, এখনও ঘুম কাটেনি চোখ থেকে, মা'র পিছু পিছু নামতে লাগল সে। খিড়কির দরজা খুলে রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়ে এল।

ঠাসঠুস শব্দটা নরম, আর পেলব। গন্ধটা অ্যাবিকে সামার ক্যাম্পের কথা মনে করিয়ে দিল। তবে কাঠের তক্তায় আগুনের লেলিহান শিখার চুম্বনের দৃশ্যটাতে স্বস্তিদায়ক কিছু নেই। দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাবি, আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ, পরমুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আগাছা ভরা উঠোন পেরিয়ে মা'র সঙ্গে ছুটল জ্বলন্ত গাছ-বাড়ির দিকে, যেখানে ঘুমিয়ে আছে লিন্ডসে।

লিন্ডসের কাছে অ্যাবির তৃতীয় স্বপ্নের বাস্তবতা ছিল যন্ত্রণাদায়ক, তার কাঁধ, পিঠ এবং হাত পুড়ে যাবার তীব্র বেদনার অনুভূতি। ডিয়ানা কেঁদে ফেললেন শুনে যখন ডাক্তাররা লিন্ডসেকে ভাগ্যবতী বলে ঘোষণা করলেন—ফার্স্ট ডিগ্রী বার্নের মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে খুব একটা ফিরে আসে না। কিন্তু বেঁচে গেছে লিন্ডসে।

আগুনের সূত্রপাত কীভাবে হলো জানে না কেউ। রাস্তার ধার ঘেঁষা গাছ-বাড়িতে, ধারণা করলেন ডিয়ানা, কোন গর্দভ নিশ্চয়ই গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় জ্বলন্ত দেশলাই ছুঁড়ে মেরেছিল।

তবে অ্যাবি আরও ভাল জানে, কারণ দৃশ্যটা দেখেছে সে স্বপ্নে। মা'র চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যাবার আগে সে স্বপ্নে দেশলাইটাকে দেখেছে। তবে গাড়ি থেকে কেউ জ্বলন্ত কাঠি ছুঁড়ে মারেনি, একটা নরম, সাদা হাত দেশলাই বাক্স থেকে কাঠি জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে গাছ-বাড়িতে।

হাসপাতালের রুমে লিন্ডসের সঙ্গে শুয়ে আছে অ্যাবি, মা চেয়ারে বসে ঘুমে ঢুলছেন, প্রাণপণে কান্না ঠেকানোর চেষ্টা করল। পারল না। কাঁধ জোড়া নড়তে লাগল কান্নার দমকে, তবে নিঃশব্দে কাঁদল অ্যাবি। গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে হাতের চেটো দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলল অ্যাবি, হাতজোড়া মুখের সামনে ধরল। বাপের মত ছোট, চওড়া হাত তার, নখের ডগা চারকোনা। স্বপ্নের হাতের মত মোটেই ফ্যাকাসে, নরম এবং ভয়ঙ্কর দেখতে নয়। তা হলে কার হাত দেখেছে সে স্বপ্নে?

আরও একটা হপ্তা গেল। এই এক হপ্তায় ভৌতিক হাতটাকে স্বপ্নে দেখেনি অ্যাবি। গত সাতদিনে তাপমাত্রা নেমে গেল আরও, ঝরা পাতার স্তূপ জমে উঠল গাছের নীচে। লিন্ডসের অবস্থা আগের চেয়ে ভাল। তবে সে আর উঠোনের ধারে কাছেও গেল না, আরেকটা গাছ-বাড়ির কথা মুখেও আনল না। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে কেউ কোন কথা বলল না, যদিও সে রাতের ভয়াল স্মৃতি ভুলতে পারেনি কেউ। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে লিন্ডসে।

অ্যাবি প্রতি রাতে বিছানায় যায় আতঙ্ক নিয়ে। সারাদিন ভয়ে অস্থির থাকে রাতে কী স্বপ্ন দেখতে হবে তা ভেবে। জানি আবার স্বপ্ন দেখবে সে, কী ঘটবে তা

নিয়ে প্রচণ্ড শঙ্কার মধ্যে আছে ও। মার্ক হেলপার্ন সেদিন স্কুল ছুটির পরে ওকে কোক কিনে দিল। কিন্তু তীব্র দুশ্চিন্তায় কাহিল ও বিপর্যস্ত অ্যাবির মাথায় এখন অন্য কিছু নেই। তাই মার্ক যখন ওকে নিয়ে শনিবার রাতে বাইরে যাবার প্রস্তাব দিল, চমকে গেল অ্যাবি।

'সাড়ে সাতটার দিকে তোমাকে তুলে নিয়ে যাব আমি,' শেষ বিকেলের রোদ গায়ে মেখে অ্যাবিদের বাড়ির সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ওরা। ঘন সোনালি চুলে হাত বুলিয়ে অ্যাবির দিকে তাকিয়ে হাসল মার্ক। 'ছবি দেখব। তারপর কিছু খাব। বেশ্ হবে, না?'

অ্যাবিও জবাবে 'বেশ হবে' বলতে যাচ্ছিল, লিন্ডসেকে দেখে আর বলা হলো না। সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে সে, এক হাতে পুতুলটার একটা ঠ্যাং ধরে আছে। 'এটা মেঝেতে পড়ে ছিল,' আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলল সে। 'তোমার ঘরে যাচ্ছিলাম। দেখি মেঝের উপরে পড়ে আছে এটা।'

ওর হাত থেকে পুতুলটা নিল অ্যাবি, সাটিনের স্কার্ট টেনেটুনে ঠিক করল। 'তুই শেলফে তুলে রাখলেই পারতি।'

'তোমাদের গলা শুনে ভাবলাম দেখি তো কে এসেছে,' বলল লিন্ডসে, 'তাই আর ওটাকে শেলফে তুলে রাখতে মনে ছিল না।' মার্কের দিকে তাকিয়ে বোকার মত হাসল সে, ঢুকে গেল ঘরে।

'তুমি পুতুল খেলো নাকি?' জিজ্ঞেস করল মার্ক।

মৃদু হাসল অ্যাবি। 'এটাকে চিলেকোঠার ঘরে পেয়েছি। অনেক পুরানো পুতুল।'

মার্ক ওর হাত থেকে পুতুলটা নিল। উল্টেপাল্টে দেখল। 'সুন্দর,' মন্তব্য করল সে। চোখ তুলে চাইল অ্যাবির দিকে। 'তবে তোমার মত সুন্দর নয়।' মুচকি হাসল মার্ক প্রশংসাটা খুবই গতানুগতিক ঢঙের হয়ে গেছে বুঝতে পেরে। ঝুঁকে এল সে, ঠোঁট ছোঁয়াল অ্যাবির গোলাপি অধরে।

চুম্বনটা অ্যাবির কাছে বে-মানান ঠেকল, দু'জনের মাঝখানে পুতুলটা প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে আছে বলে। তা ছাড়া সে এত বেশি অবাক হয়ে গিয়েছিল, দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারল না। অবশ্য তাতে কিছু এল গেল না। মার্ক আবার হাসল অ্যাবির দিকে তাকিয়ে, পুতুলটা ওর হাতে দিয়ে পা বাড়াল নিজের গাড়ির দিকে।

টমেটো লাল রঙের গাড়িতে উঠে বসল লম্বা পা জোড়া ভাঁজ করে, একবার হর্ন বাজাল, তারপর চলে গেল। অ্যাবি ঘরে ঢোকার আগে পুতুলটাকে বুকে চেপে ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ।

শুক্রবার রাতে আবার স্বপ্ন দেখল সে।

মাঝ রাতে জেগে গেল অ্যাবি, চাদরে মুড়ে আছে পা, কানে ধাক্কা দিচ্ছে রক্ত-স্রোত। বিপদের উপলব্ধিটা এমন তীব্র, সারারাত আর ঘুমাতে পারল না মেয়েটা। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ভোরের অপেক্ষায় থাকল। একসময় দেখল

রান্নাঘরের জানালা দিয়ে সূর্যের প্রথম আলো ঢুকছে।

অ্যাবি আবার সেই হাতজোড়াকে দেখেছে। তবে এবারে শুধু হাত নয়, গোটা শরীর। ছোটখাট কাঠামো, শিশুদের মত। ছায়ার মধ্যে ছিল শরীরটা, পরিষ্কার বোঝা যায়নি চেহারা। শুধু নরম হাত আর বিবর্ণ গালের রেখা দেখতে পেয়েছে অ্যাবি। ওটা নড়াচড়া করছিল, হাঁটছিল। অ্যাবি রাস্তার নুড়ি-পাথরের শব্দ শুনেছে, ফিটফাট একটা পোশাক দেখেছে এক ঝলক, চকচকে কালো জুতোর ডগাও চোখে পড়েছে। তারপর একটা শব্দ কানে এসেছে, শ্বাস পড়ার শব্দ, বাচ্চাটা হেঁটে যাচ্ছে, পেছনে নরম ও উত্তেজিত খিকখিক একটা হাসির আওয়াজ হচ্ছিল।

তারপর রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করে শিশুর মত কাঠামোটা, পায়ের ধাক্কায় ছিটকে যাচ্ছিল নুড়ি-পাথর, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠছিল। অ্যাবি টের পেয়েছে তারও শ্বাসের গতি দ্রুত হয়ে উঠছিল। সে বুঝতে পারছিল না কী ঘটছে, তবে খারাপ একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে উপলব্ধি করতে পারছিল। তবে খারাপ ব্যাপারটা কতটুকু খারাপ, জানা ছিল না তার। অ্যাবি হঠাৎই দেখতে পায় হেডলাইটের চোখ ধাঁধানো একজোড়া আলো, ইঞ্জিনের গুঞ্জন হঠাৎ পরিণত হয় গর্জনে, গাড়িটা ক্রমে কাছিয়ে আসতে থাকে, অ্যাবি দেখে ছোট, ছায়াময় শরীরটা ইচ্ছে করে গাড়ি আসার রাস্তায় উঠে এসেছে।

তারপর ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ ক্রিইইইচ আওয়াজ, সেই সাথে ধাতব আর কাঁচ ভাঙার গা গোলানো শব্দ। এক মুহূর্ত নীরবতা, তারপর, জেগে ওঠার আগে শেষ শব্দটা শুনতে পেয়েছে অ্যাবি–নরম, খিকখিক হাসি।

আজ শনিবার। কখন মার্কের সঙ্গে দেখা হবে তার অপেক্ষার প্রহর গুণবে যে মেয়ে সে তা না করে ভয়ঙ্কর স্বপ্নের কথা মনে করে সিঁটিয়ে রইল সারা দিন। স্বপ্নটা তার মস্তিষ্কে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে রইল।

ইরিন ভাগ্যবতী–সিঁড়ি দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভাঙতে পারত তার। হলিরও ভাগ্য ভাল। ভাঙা কাঁচের টুকরো ওর চোখ কিংবা ঘাড়ে ঢুকে যেতে পারত। অন্ধ হয়ে যেত হলি, মৃত্যুও অস্বাভাবিক ছিল না। আগুনে পুড়ে মরে যেতে পারত লিন্ডসেও, গাছ-বাড়ির মত পুড়ে কয়লা হয়ে যেত সে।

এবারে চতুর্থ স্বপ্ন। কাল খবরের কাগজে কি কোন দুর্ঘটনার খবর পড়তে হবে অ্যাবিকে? পড়তে হবে সেই খবর যা সে ইতিমধ্যে জানে–গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, কেউ আহত হয়েছে, সম্ভবত কোন শিশু?

ক্লান্ত ও খিটখিটে মেজাজ নিয়ে সারাদিন এ ঘর ও ঘর করে বেড়াল অ্যাবি, জানালা দিয়ে মা আর লিন্ডসেকে দেখল। ওরা পাতা পরিষ্কার করছে। আজ সকালে কুয়াশা পড়েছে। শীঘ্রি ঘাসের রঙ বিবর্ণ ও ম্লান হয়ে উঠবে। সমস্ত পাতা ঝরে কঙ্কাল হয়ে যাবে গাছগুলো, সাঁঝ নেমে আসবে আরও দ্রুত।

সাতটার সময় গোসল করল অ্যাবি, শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে নিল চুল। গরম জলের ছোঁয়ায় আড়ষ্ট পেশিগুলোয় ঢিল পড়ল, ভার ভার মাথাটাও অনেকটা হালকা লাগল। মোটা তোয়ালেতে শরীর মুড়ে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল অ্যাবি।

ক্লজিটের উপরে চোখ ঘুরছে অ্যাবির, শার্ট, স্কার্ট এবং প্যান্ট দেখছে, পছন্দ হচ্ছে না কোনটাই। এমন সময় শব্দটা শুনতে পেল সে…সেই খিকখিক হাসি। এত পরিষ্কার, এত কাছে, চরকির মত ঘুরল অ্যাবি, আশা করল পেছনে দেখতে পাবে কাউকে।

কিন্তু ঘর খালি।

মাথা ঝাঁকাল অ্যাবি, যেন দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলছে। ফিরল ক্লজিটের দিকে। গাঢ় কমলা রঙের একটা ব্লাউজ পছন্দ হলো, নরম এবং মখমলের মত মসৃণ। হাতঘড়ির দিকে নজর গেল ওর। আটটা বাজে। মার্কের আধঘণ্টা দেরি।

এক ঘণ্টা পরে কর্ডলেস ফোনটা নিজের ঘরে নিয়ে এল অ্যাবি, ফোন করল মার্কের বাসায়। বুক ধুকপুক করছে, ডায়াল করার সময় হাত কাঁপল। ভয়াবহ কিছু একটা ঘটে গেছে, কুডাক ডাকছে মন। মার্কের মা ফোন ধরলেন। অ্যাবি মার্ককে চাইল এবং অপর প্রান্ত থেকে ফোঁপানির আওয়াজ শুনে জমে বরফ হয়ে গেল।

মার্কের মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন মারা গেছে তার ছেলে, বিকেলবেলা, হাসপাতালে।

'এক বন্ধুর বাসা থেকে ফিরছিল ও,' জানালেন মিসেস হেলপার্ন। 'মার্ক আমার খুব ভাল ড্রাইভার, অত্যন্ত সাবধানে গাড়ি চালাত। কিন্তু নিশ্চয়ই গাড়িটা আচমকা ঘুরিয়ে ফেলতে হয়েছিল ওকে…' বিরতি দিলেন তিনি এক মুহূর্তের জন্য, অ্যাবি শুনল ভদ্রমহিলা ফোঁপাচ্ছেন। 'পঁয়ত্রিশ মাইল গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল ও, ওখানকার স্পীড-লিমিট তাই ছিল। কিন্তু পুলিস বলেছে ওই গতিতে গাড়ি চালালেও যদি গাছে-টাছে ধাক্কা লাগে…।' আবার থেমে গেলেন তিনি।

অ্যাবির মুখের ভিতরটা শুকিয়ে খটখটে, কথা বলার সময় কর্কশ শোনাল কণ্ঠস্বর। 'কেন?' জিজ্ঞেস করল ও। 'আপনি বললেন ওকে আচমকা গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে হয়েছিল। কিন্তু কেন?' 'বাচ্চা মেয়েটার জন্যে,' জবাব দিলেন মিসেস হেলপার্ন। 'ওরা ওকে অ্যাম্বুলেন্সে নেয়ার সময় মার্ক বলেছে একটা ছোট মেয়েকে রাস্তা দিয়ে দৌড়ে আসতে দেখে সে। পরিষ্কার নাকি দেখেছে। পুলিস মেয়েটাকে অনেক খুঁজেছে। সন্ধান পায়নি।'

গলা একেবারে ভেঙে গেল ভদ্রমহিলার, কোন মতে বিদায় বলে নামিয়ে রাখলেন ফোন।

চোখ বুজল অ্যাবি। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। দাঁড়িয়ে আছে ও। জানে না বসলে যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে। কিন্তু নড়াচড়ার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই গায়ে, দাঁড়িয়েই রইল। মাথা ঘুরছে, টের পেল শরীরও দুলছে।

ঠিক তখন খিকখিক হাসিটা আবার শুনতে পেল অ্যাবি। শ্বাস চেপে রাখল ও, জানে আবার শুনবে শব্দটা। আবার শুনতে পেল ভৌতিক, ফিসফিসে খিকখিক হাসির শব্দ, ঘরের মধ্যে ভাসতে ভাসতে যেন এগিয়ে গেল ওর কাছে। ধীর গতিতে ঘুরল অ্যাবি, চোখ মেলল, দৃষ্টি স্থির হলো পুতুলটার চকচকে আকাশ-নীল

চোখে।

একটি ছোট মেয়ে।

বেগুনি রঙের পোশাক পরা একটি ছোট মেয়ে, নরম, বিবর্ণ হাত, পায়ে চকচকে কালো জুতো। অ্যাবি চিলেকোঠার ময়লা ঘেঁটে যে পুতুলটাকে খুঁজে এনেছে অবিকল তার মত···ওকে কি জ্যান্ত করেছে সে? এমনই জ্যান্ত যে ধাক্কা মেরে অ্যাবির এক বান্ধবীকে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিতে পারে, আরেক বান্ধবীর মাথায় ভাঙতে পারে বাতি, দেশলাই কাঠিতে আগুন ধরিয়ে গাছ-বাড়ি ধ্বংস করে মেরে ফেলার চেষ্টা করতে পারে তার বোনকে?

এ পুতুলের এমনই শক্তি যে কিনা রাস্তায় গিয়ে ষোলো বছরের এক নিষ্পাপ তরুণকে খুন পর্যন্ত করে ফেলে?

দাঁড়িয়ে আছে অ্যাবি, মহা আতঙ্কে লক্ষ করল পুতুলটার চাউনিতে পরিবর্তন ঘটেছে, সত্যি সত্যি জ্যান্ত হয়ে উঠেছে চোখজোড়া, সোজা তাকাল অ্যাবির দিকে। দৃষ্টিতে প্রকট বিজয় উল্লাস। মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য ওভাবে তাকিয়ে থাকল পুতুল। কিন্তু ওই সময়টুকুই যথেষ্ট। ওর ভিতরে জীবন আছে, এক ধরনের জীবন, এক ধরনের ভয়ঙ্কর শক্তি যে শক্তি মানুষ হত্যা করে এবং যাকে না থামানো পর্যন্ত আরও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাবে।

অ্যাবি জানে এখন ওর করণীয় কী। গলা দিয়ে ঠেলে আসা চিৎকারটা গিলে ফেলল, লম্বা পা ফেলে দাঁড়াল শেলফের সামনে, এক টানে তাক থেকে নামিয়ে আনল পুতুলটাকে। ওর ভিতরে জীবন থাকলেও আর দেখতে চায় না অ্যাবি। সে ওটাকে সুন্দর কাঠের বাক্সটিতে ঢোকাল। তারপর ঢাকনি ফেলে চকমকে ছিটকিনি আটকে দিল।

এখন এটাকে কফিনের মত লাগছে।

সাটিনের ঝালর দেওয়া পুতুলের জন্য কফিন।

দশ মিনিট পরে মা'র গাড়িটা নিয়ে পাহাড়ি রাস্তার মাথায় চলে এল অ্যাবি। বাক্সটা ওর পাশের সীটে পড়ে আছে। ওটার দিকে হাত বাড়াল অ্যাবি, একটা শব্দ শুনতে পেল। অস্পষ্ট, টুপটুপ শব্দ, যেন নুড়ি-পাথরের গায়ে ঠোকাঠুকি লাগছে। তবে ওটা নুড়ি-পাথর নয়।

ছোট মুঠি দিয়ে ঘুসি মারছে কাঠের গায়ে।

গাড়ি থেকে বের হলো অ্যাবি, শোঁ শোঁ বাতাসে চুল উড়তে লাগল। বাক্সটা হাতে নিয়ে পাহাড়চুড়োর কিনারে এসে দাঁড়াল। এক মুহূর্তও দ্বিধা করল না। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাক্সটাকে ছুঁড়ে মারল অ্যাবি। দেখল ওটা ডিগবাজি খেতে খেতে নীচে নেমে যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় বারকয়েক ঝিকিয়ে উঠল পিতল, শেষে নীচের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

পাহাড়চুড়োয় একা, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অ্যাবি। হিমেল বাতাসে কাঁপ ধরে গেছে শরীরে, কিন্তু ও অপেক্ষা করল। নিশ্চিত হতে চায়। কান খাড়া করে রেখেছে অ্যাবি। অবশেষে ভোঁতা তবে পরিষ্কার শব্দটা শোনা গেল। পাহাড়ের

নীচে, ধারাল চাঁইয়ের সাথে বাড়ি খেয়েছে বাক্স। একবার, দু'বার, তিনবার। তারপর নেমে এল নিস্তব্ধতা।

ঝামেলা শেষ। পুতুলটা বিদায় হয়েছে, অ্যাবি বাড়ির পথ ধরল। জানে এবার থেকে সে শান্তিতে ঘুমাতে পারবে, ওই বিবর্ণ, ভয়ঙ্কর হাতজোড়া আর স্বপ্নে তাড়া করে ফিরবে না ওকে।

লোকটা অবশেষে খুলে ফেলল বাক্সের ছিটকিনি। উঁকি দিল ভিতরে। হাসি ফুটল মুখে। সে অবাক হয়েছে, খুশিও। সে নিশ্চিত এটা সত্যিকারের কোন অ্যান্টিক, অনেক দামী। হাতজোড়া আর মুখখানা চমৎকার চীনামাটি দিয়ে তৈরি, পোশাকটা অবশ্যই খাঁটি সাটিনের। আজকাল এরকম পুতুল কেউ বানায় না।

অ্যান্টিক হোক বা না হোক, সিদ্ধান্ত নিল লোকটা, এটাকে বিক্রি করবে না। তার নয় বছরের একটি মেয়ে আছে, পুতুলের জন্য পাগল। মেয়েকে এই চমৎকার জিনিসটি উপহার দেবে সে। পরিতৃপ্তির হাসি ঠোঁটে, বাক্সটা বগলে চেপে বাড়ির পথ ধরল লোকটা।

একটি মেয়ে একা

স্টেশনে পৌঁছুতে অনেক দেরি করে ফেলেছে ট্রেন। ন'টার বেশি বাজে। হাই টাওয়ার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে নাটালি। একা।

বন্ধ হয়ে গেছে স্টেশন। এটা স্রেফ একটা ওয়ে স্টপ। এদিকে শহর-টহর চোখে পড়ছে না। কী করবে বুঝতে পারছে না নাটালি। ড. ব্রেসগার্ডলের স্টেশনে আসার কথা। লন্ডন ছাড়ার আগে চাচাকে সে চিঠি লিখেছে। বলে দিয়েছে কখন পৌঁছুবে। কিন্তু ট্রেন লেট করায় সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। চাচা বোধহয় এসেছিলেন। অপেক্ষায় থেকে শেষে চলে গেছেন।

চারপাশে একবার নজর বোলাল নাটালি অস্বস্তি নিয়ে। হঠাৎ দেখতে পেল একটা টেলিফোন বুদ। এবার নাটালির সমস্যার সমাধানের উপায় পাওয়া গেছে। ড. ব্রেসগার্ডলের লেখা সর্বশেষ চিঠিটা আছে ওর পার্সে। তাতে ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার দুইই দেওয়া। বুদের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ব্যাগ হাতড়ে কাগজটা বের করল নাটালি।

লাইন পেতে সমস্যা হলো। অপারেটর কানেকশনই দিতে পারছে না। অনেকক্ষণ বিজবিজ, হুঁশহাশ নানা বিচিত্র শব্দ হলো লাইনে। বুদের কাঁচের দেয়াল থেকে স্টেশনের পেছনে জাহাজের সারি নজরে এল নাটালির। লাইন পাবার সমস্যার কারণ বোঝা গেল। শত হলেও এটা পশ্চিমা দেশ, মনে মনে বলল নাটালি। ব্যবস্থাপনা খানিকটা সেকেলে তো হবেই—

'হ্যালো, হ্যালো!'

এক মহিলার কণ্ঠ ভেসে এল ফোনে, তারস্বরে চিল্লাচ্ছে। এখন আর অদ্ভুত বিজবিজ শব্দটা শোনা যাচ্ছে না। বরং কতগুলো অস্পষ্ট গলা শুনতে পাচ্ছে নাটালি। মাউথ পিস মুখে চেপে কথা বলতে শুরু করল সে।

'নাটালি রিভারস বলছি,' জানাল ও। 'ড. ব্রেসগার্ডল আছেন?'

'কী নাম বললেন?'

'নাটালি রিভারস। আমি ডক্টরের ভাতিঝি।'

'ডক্টরের কী, মিস?'

'ভাতিঝি,' কথাটা আবার বলল নাটালি। 'আমি চাচার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, প্লিজ।'

'একটু ধরুন।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। ফোন লাইনে মিশ্রিত কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হয়ে উঠল, তারপর গম্ভীর একটা গলা ভেসে এল, অন্য স্বরগুলো থেকে আলাদা।

'ড. ব্রেসগার্ডল বলছি। মাইডিয়ার নাটালি, তোমাকে আমি আশাই করিনি!'

'আশা করেননি? কিন্তু আমি তো আপনাকে বিকেলেই লন্ডন থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি।' অধৈর্য শোনাল নাটালির কণ্ঠ। 'পাননি?'

'ডাক বিভাগের সার্ভিস এখানে খুব একটা ভাল নয়।' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসলেন ডক্টর। 'না ডিয়ার, তোমার টেলিগ্রাম আমার কাছে পৌঁছেনি। কিন্তু তুমি পৌঁছে গেছ,' আবার হাসলেন তিনি। 'তুমি কোথায়, ডিয়ার?'

'হাই টাওয়ার স্টেশনে।'

'জায়গাটা ঠিক বিপরীত দিকে।'

'বিপরীত দিকে?'

'পিটার কিকের বাড়ির বিপরীত দিকে। তুমি ফোন করার আগে আগে ও ফোন করেছিল। অ্যাপেনডিক্স সমস্যা। বলেছিলাম যাব ওকে দেখতে।'

'এখনও এসব সাধারণ চিকিৎসার জন্যে ওরা আপনাকে ডাকে?'

'ইমার্জেন্সি, মাই ডিয়ার। এদিকে ডাক্তার আরও আছেন। তবে তাদের ভাগ্যে রোগী খুব কমই জোটে।' আবার হাসতে শুরু করলেন ড. ব্রেসগার্ডল, তারপর থেমে গেলেন। 'শোনো। তুমি স্টেশনেই থাকো। আমি মিস প্লুমারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাকে নিয়ে আসার জন্যে। তোমার সাথে লাগেজ কি বেশি?'

'শুধু আমার ট্রাভেল ব্যাগ। বাকি জিনিসপত্র বোটে আসছে।'

'বোট?'

'চিঠিতে বোটের কথা লিখিনি আমি?'

'ও হ্যাঁ। লিখেছ। ঠিক আছে। কোন সমস্যা নেই। মিস প্লুমার ওয়াগন নিয়ে সোজা তোমার কাছে চলে যাবে।'

'আমি প্ল্যাটফর্মের সামনে থাকব।'

'কী বললে? জোরে বলো। শুনতে পাচ্ছি না।'

'বললাম যে প্ল্যাটফর্মের সামনে থাকব।'

'আচ্ছা,' আবার খিক খিক হাসলেন ডক্টর। 'এখানে পার্টি চলছে কিনা। তাই গোলমালে–'

'আমি গেলে অসুবিধা হবে না তো? না, মানে। আপনি তো জানতেন না যে আমি আসব।'

'আরে না! কোন অসুবিধা হবে না। তুমি আসার আগেই হয়তো ওরা চলে যাবে। তুমি প্লুমারের জন্যে অপেক্ষা করো।'

ফোন নামিয়ে রাখার শব্দ পেল নাটালি। ফিরে এল প্ল্যাটফর্মে। অল্পক্ষণের মধ্যে চলে এল একটা স্টেশন ওয়াগন। ট্র্যাকের কোনায় স্কিড করে দাঁড়িয়ে পড়ল। লম্বা, পাতলা ধূসর চুলের এক মহিলা, গায়ে কোঁচকানো সাদা ইউনিফর্ম, বেরিয়ে এল ওয়াগনের দরজা খুলে। ইশারায় ডাকল নাটালিকে।

'চলে আসুন,' বলল সে। 'আমি এটা পেছনে তুলে দিচ্ছি।' ট্রাভেল ব্যাগটা সে ওয়াগনের পেছনে ছুঁড়ে ফেলল। 'উঠে পড়ুন–আমরা এখুনি রওনা হব।'

নাটালির দিকের দরজা বন্ধ না হতেই মিস প্লুমার স্টার্ট দিল ইঞ্জিন, গাড়ি এক লাফে উঠে এল রাস্তায়।

দ্রুত স্পিড উঠে গেল সত্তরে। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল নাটালি। মিস প্লুমার আড়চোখে দেখল তাকে।

'দুঃখিত,' বলল সে। 'ডাক্তার কলে গেছেন। তাই আমার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার।'

'ও হ্যাঁ। চাচা বলেছে আমাকে। বলেছে তার বাসা ভর্তি লোক।'

মিস প্লুমার চৌমাথায় এসে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল, ক্যাঁচ করে উঠল টায়ার রাস্তার সাথে ঘষায়। কিন্তু মহিলা স্পিড কমাল না। রাস্তার দিকে না তাকিয়ে কথা বলে যাবে ঠিক করল নাটালি। তাতে ভয় কম লাগবে।

'আমার চাচা মানুষ কেমন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'দেখেননি তাঁকে আগে?'

'না। খুব ছোট বেলায় বাবা মা আমাকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া চলে যায়। ইংল্যান্ডে এই প্রথম এসেছি। বলা উচিত, ক্যানবেরা ছেড়ে এই প্রথম কোথাও বেরুলাম আমি।'

'আর কেউ আসেনি আপনার সঙ্গে?'

'বাবা-মা মাস দুই আগে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে,' বলল নাটালি। 'চাচা বলেনি আপনাকে?'

'নাহ্। আসলে অনেকদিন ওনার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার।' হঠাৎ খ্যাঁক করে উঠল মিস প্লুমার। গাড়িটা প্রবল একটা ঝাঁকুনি খেল। 'মোটর অ্যাক্সিডেন্ট, অ্যাঁ? কিছু লোক আছে গাড়ি চালাতেই জানে না। তবুও গাড়ি চালাতে যায়। ডক্টর মাঝে মাঝে বলেন কথাটা।'

মাথা ঘোরাল সে, পিট পিট করে তাকাল নাটালির দিকে। 'এখানে কি

থাকতে এসেছেন?'

'জ্বী। আমার অভিভাবক বলতে এখন শুধু এই চাচাই। অথচ চাচার চেহারাই দেখিনি আজ পর্যন্ত। চিঠি পড়ে তো আর মানুষের সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না।' সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মিস প্লুমার। নাটালি খানিক ইতস্তত করে বলল, 'সত্যি বলতে কি, আমার একটু অস্বস্তিই লাগছে। কারণ এর আগে কোন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে পরিচয় হয়নি আমার।'

'হয়নি, না?' বলল মিস প্লুমার। 'তা হলে আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলতে হবে। আমার সাথে কয়েকজনের পরিচয় হয়েছে। ওদের মধ্যে ড. ব্রেসগার্ডলই সেরা। আপনার চাচার রোগীর অভাব নেই। প্রচুর পয়সা কামিয়েছেন তিনি। বাড়িও কিনে ফেলেছেন।' বলতে বলতে একটা বিশাল ড্রাইভওয়ে দিয়ে একজোড়া গেটের ভিতরে ঢুকে পড়ল প্লুমার গাড়ি নিয়ে। ড্রাইভওয়েটা চলে গেছে প্রকাণ্ড এক বাড়ির দিকে। গাছপালা দিয়ে ঘেরা বাড়িটি। বাড়ির জানালায় হালকা আলোর রেখা দেখতে পেল নাটালি। ওটাই ওর চাচার বাড়ি বুঝতে পারল সে।

'এহ্‌হে,' বিড়বিড় করল নাটালি।

'কী হলো?'

'আজ শনিবার–চাচার গেস্টরা এসেছে। আর আমি অনাহূতের মত–'

'ও নিয়ে আর কথা বলবেন না তো,' বলল মিস প্লুমার। 'এখানে কোন ফর্মালিটির ব্যাপার নেই। এখানে আসার আগে ডাক্তার তাই বলেছিলেন আমাকে। এটাকে নিজের বাড়ি বলে ভাবুন।'

খ্যাঁক করে উঠল মিস প্লুমার। একই সাথে চেপে ধরেছে ব্রেক। কালো একটা লিমোজিনের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ল স্টেশন ওয়াগন।

'নেমে পড়ুন,' মিস প্লুমার পেছনের সীট থেকে ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। ঘাড় ঘুরিয়ে ইশারা করল নাটালিকে তার পেছন পেছন আসতে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল প্লুমার। চাবি খুঁজছে। 'কড়া নেড়ে লাভ হবে না,' বলল সে। 'কেউ শুনতে পাবে না।' খুলে গেল দরজা। ফোনে অস্পষ্ট যে কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিল নাটালি এখন সেই স্বরগুলোকে মনে হলো তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল নাটালি। ইতস্তত করছে ভিতরে যেতে। মিস প্লুমার ঢুকে গেছে ভিতরে।

'চলে আসুন! চলে আসুন!' ডাকল সে।

অনুগতের মত তার পেছন পেছন গেল নাটালি। দরজা বন্ধ করে দিল মিস প্লুমার। ঘরে প্রচুর আলো। চোখ ঝলসে যায়।

লম্বা, নির্জন একটা হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে নাটালি। ঠিক তার সামনে প্রকাণ্ড সিঁড়ি; রেলিং এবং দেয়ালের মাঝখানে একটি ডেস্ক এবং একখানা চেয়ার। বামে কালো, সরু দরজা–ড. ব্রেসগার্ডলের প্রাইভেট অফিস ওটা। দরজার মাথায় ছোট পেতলের প্লেটে লেখা নাম দেখে বোঝা গেল। নাটালির ডানে বিশাল, খোলা বৈঠকখানা। জানালায় ভারী পর্দা ঝুলছে। বন্ধ। ওদিক থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে

আসছে শব্দ।

হল পার হয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল নাটালি। আড়চোখে তাকাল বৈঠকখানার দিকে। বড় একটা টেবিল ঘিরে বসেছে জনা কয়েক মানুষ। কথা বলছে, একজন আরেকজনের প্রতি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করছে। টেবিল টপে সার বাঁধা অনেকগুলো মদের বোতল। হঠাৎ, কী কারণে হো হো করে হেসে উঠল একজন।

প্রবেশ পথ পার হয়ে গেল নাটালি আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। কেউ ওর দিকে না তাকালেই হয়। কারও মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায় না নাটালি। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল মিস প্লুমার ওর ব্যাগ নিয়ে আসছে কিনা। আসছে। তবে প্লুমারের হাত খালি। সিঁড়িতে পা রাখতেই বলে উঠল প্লুমার, 'ওপরে যাবেন নাকি? তারচে' এদিকে আসুন। অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

'মুখ হাত ধুয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নেব ভাবছিলাম।'

'আগে আপনার ঘর ঠিক করি। তারপর যাবেন। ডক্টর আগে থেকে কিছুই বলেননি, জানেনই তো।'

'শুধু মুখ হাত ধুয়ে নিলেই চলত–'

'ডক্টর যে কোন মুহূর্তে চলে আসবেন। তার জন্যে অপেক্ষা করুন,' বলে নাটালির হাত চেপে ধরল মহিলা। ঠিক এরকমভাবে গাড়ি চালাবার সময় হুইল ধরেছিল সে। নাটালিকে প্রায় টানতে টানতে আলোকিত ঘরটির দিকে নিয়ে চলল।

'ইনি আমাদের ডক্টরের ভাতিঝি,' ঘোষণার সুরে বলল মিস প্লুমার। 'মিস নাটালি রিভারস, অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন।' প্রায় সবগুলো মাথা ঘুরে গেল নাটালির দিকে। খাটো, মোটা, হাসিখুশি চেহারার এক লোক তার আধখালি মদের গ্লাসটা নাড়ল নাটালিকে উদ্দেশ্য করে।

'সোজা অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন, অ্যাঁ?' গ্লাসটা এগিয়ে দিল সে। 'আপনার নিশ্চয়ই তেষ্টা পেয়েছে। নিন, এটা পান করুন। আমি আরেকটা নিচ্ছি।' নাটালি কিছু বলার আগেই সে ফিরে গেল টেবিলে, যোগ দিল সঙ্গীদের সাথে। 'মেজর হ্যামিলটন,' ফিসফিস করে বলল মিস প্লুমার। 'মজার মানুষ। তবে আজ সামান্য মাতাল হয়ে পড়েছেন।'

চলে গেল মিস প্লুমার। হাতের গ্লাসটার দিকে অস্বস্তি নিয়ে তাকাল নাটালি। এটা কোথায় রাখবে বুঝে উঠতে পারছে না।

'আমার কাছে দিন,' লম্বা, ধূসর-চুলের, মোচঅলা অভিজাত চেহারার এক লোক এগিয়ে এল। নাটালির হাত থেকে নিয়ে নিল গ্লাস।

'ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই। মেজরকে ক্ষমা করে দেবেন। পার্টির মেজাজে আছেন বুঝতেই পারছেন।' তিনজন পুরুষ এবং একজন সুন্দরী নারী দল বেঁধে গল্প করছিল। তাদের উদ্দেশ্য করে নড করল লম্বা মানুষটি। 'আর যেহেতু এটা একটা বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান–'

'অঃ আপনি এখানে।' মেজর হ্যামিলটন নাচতে নাচতে এগিয়ে এল নাটালির কাছে। হাতে মদের নতুন গ্লাস। লালচে মুখে তাজা হাসি। 'আবার চলে এলাম,' ঘোষণা করল সে। 'বুমেরাং-এর মত, তাই না?'

দুলে দুলে হাসতে লাগল মেজর। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, 'অস্ট্রেলিয়া তো বুমেরাং-এর রাজ্য, তাই না? গ্যালিপোলিতে আপনার মত কয়েকজন অসির সাথে পরিচয় হয়েছিল। অবশ্য সে অনেক আগের কথা—'

'প্লিজ, মেজর,' লম্বা লোকটি হাসল নাটালির দিকে তাকিয়ে। তার উপস্থিতির মধ্যে নিরাপদ একটা ব্যাপার আছে, আর মানুষটাকে কেন জানি চেনা চেনাও লাগছে। একে আগে কোথাও দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না নাটালি। দেখল লম্বা লোকটি মেজরের কাছে গিয়ে তার হাত থেকে ড্রিঙ্কের গ্লাসটি নিয়ে নিল।

'দেখুন দিকি' কথা বলার সময় থুথু ছিটল মেজরের মুখ থেকে।

'অনেক গিলেছেন, ওল্ড বয়। এখন যাবার সময় হয়ে গেছে।'

মেজর চারপাশে নজর বুলাল, শরীরের পাশে দুলছে হাতজোড়া। 'সবাই দেখছি মদ গিলছে!' জড়ানো গলায় বলল সে। নিজের গ্লাসের জন্য হাত বাড়াল। কিন্তু লম্বা মানুষটি এড়িয়ে গেল তাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে নাটালির দিকে তাকিয়ে হাসল সে, তারপর মেজরকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিচু গলায় কী যেন বলতে লাগল। মাতাল মেজর সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে দ্রুত মাথা ঝাঁকাল।

ঘরের চারদিকটা একবার দেখল নাটালি। কেউ তাকে লক্ষ করছে না শুধু এক পৌঢ়া মহিলা ছাড়া। সে একটা পিয়ানোর সামনে টুলে বসে আছে একা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল নাটালির দিকে। নাটালির ভারী অস্বস্তি হতে লাগল। যেন বিশাল রঙ্গমঞ্চে অনাহুতের মত ঢুকে পড়েছে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল নাটালি। আবার চোখ চলে গেল কাঁধ খোলা ব্লাউজ পরা সেই সুন্দরী মহিলার দিকে। মিস প্লুমারকে খুঁজল নাটালি। কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না।

হলঘরে ফিরে এল নাটালি, উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

'মিস প্লুমার।' ডাকল সে।

জবাব নেই।

এমন সময় চোখের কোণ দিয়ে দেখল হলঘরের ওপাশের রুমটির আধ ভেজানো দরজাটি এখন খোলা। রুমটি থেকে বেরিয়ে এল মিস প্লুমার। হাতে একজোড়া কাঁচি। নাটালি তাকে ডাকার আগেই সে দ্রুত অন্য দিকে চলে গেল।

এখানকার লোকগুলো যেন কেমন, ভাবছে নাটালি। অবশ্য সব পার্টিতেই অদ্ভুত লোকজনের আগমন ঘটে। মিস প্লুমারের পেছন পেছন যাবে ভাবছিল নাটালি। এ জন্য সিঁড়ি বেয়ে নেমেও এসেছিল। কিন্তু খোলা দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এটা তার চাচার কনসালটেশন রুম। চাচার কনসালটেশন রুম দেখার খুব শখ ছিল নাটালির। সে কৌতূহল নিয়ে দেখতে লাগল। আরামদায়ক একটা ঘর।

ঘর বোঝাই বই। বইয়ের শেলফের সামনে চামড়া মোড়ানো আসবাব। ডক্টরের কাউচ বা আসনটি ঘরের এক কোণে, দেয়ালের কাছে। ওটার কাছে বড় মেহগনি ডেস্ক। ডেস্কের উপরের অংশ খালি। ওখানে ফোন রাখা হয়। তবে ডেস্কে ফোন নেই। আছে বাদামী রঙের ফোন কর্ডের সরু একটা ফাঁস।

ফাঁসটা দেখে অস্বস্তির ভাবটা আবার ফিরে এল নাটালির মাঝে। নিজের অজান্তেই ঘরে ঢুকে পড়ল ও। তাকাল ডেস্কটপ এবং বাদামী কর্ডের দিকে।

ঠিক তখন নাটালি বুঝতে পারল কেন তার অস্বস্তি লাগছে। ফোনের তারের শেষ মাথা দেয়ালের কাছ থেকে নিখুঁতভাবে কেটে ফেলা হয়েছে।

'মিস প্লুমার!' বিড়বিড় করল নাটালি। মনে পড়ে গেল একটু আগে মিস প্লুমারকে কাঁচি হাতে এ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে সে। কিন্তু ফোনের তার কাটবে কেন সে?

ঘুরে দাঁড়াল নাটালি। একই সাথে ভিতরে ঢুকে পড়ল অভিজাত চেহারার সেই লম্বা মানুষটি।

'ফোনের কোন প্রয়োজন হবে না,' এমনভাবে কথাটা বলল সে যেন নাটালির মনের কথা পড়তে পারছে। 'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি ওটা একটা বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান।' কথা শেষ করে খিকখিক হাসল সে।

লোকটিকে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মত খুব চেনা চেনা লাগল নাটালির কাছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সব কথা। এই কণ্ঠই সে শুনেছে স্টেশনের ফোনে। একই রকম ভঙ্গিতে হেসেছে লোকটি।

'আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন,' চেঁচিয়ে উঠল নাটালি। 'আপনি ড. ব্রেসগার্ডল নন?'

'না, মাই ডিয়ার,' নাটালির পাশ দিয়ে যাবার সময় মাথা নাড়ল সে এদিক-ওদিক। 'তোমাকে এখানে কেউ আশা করেনি,' আপনি থেকে চট করে তুমিতে চলে এল লোকটা। 'আমরা যাই যাই করছি এমন সময় তুমি এলে। কাজেই বানিয়ে অনেক কিছুই বলতে হয়েছে।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর নাটালি জানতে চাইল, 'আমার চাচা কই?'

'ওই যে ওখানে।' আঙুল তুলে দেখাল লম্বা লোকটি। কাউচ এবং দেয়ালের মাঝখানে যেদিকে ইঙ্গিত করেছে সে সেখানে মানুষ নয়, রক্তাক্ত একটা মাংস পিণ্ড পড়ে রয়েছে।

'পরিষ্কার করার সময় পাইনি আমরা,' ব্যাখ্যা করল লোকটা। 'হঠাৎ করেই ঘটনাটা ঘটে গেল। তারপর সবাই মদ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল–।'

তার গমগমে কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুলছে ঘরে। অন্য সমস্ত কোলাহল হঠাৎ করেই থেমে গেছে। মুখ তুলে চাইল নাটালি। দোরগোড়ায় ভিড় করেছে সবাই। হঠাৎ ভাগ হয়ে গেল ভিড়টা, ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মিস প্লুমার। দ্রুত ঢুকল ঘরে। সাদা ইউনিফর্মের উপর বেমানান একটা ফারকোট চাপিয়েছে সে।

'ওহ্ মাই!' আঁতকে উঠল সে, 'তুমি তা হলে দেখে ফেলেছ ওকে!'

মাথা ঝাঁকাল নাটালি। এক পা বাড়াল সামনে। 'কিছু একটা করুন,' আকুল গলায় বলল সে। 'প্লিজ!'

'তুমি তো এখনও অন্যদেরকে দেখোইনি।' বলল মিস প্লুমার। 'কারণ ওরা সবাই দোতলায়। ডাক্তারের কর্মচারীরা। সে আরও ভয়ঙ্কর দৃশ্য।'

ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে নারী-পুরুষের দলটা। দাঁড়িয়েছে প্লুমারের পেছনে। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে নাটালির দিকে।

নাটালি কাতর গলায় বলল, 'এ নির্ঘাত কোন পাগলের কাজ।' চিৎকার করে উঠল ও। 'আর পাগলইবা এখানে আসবে কেন? পাগল তো থাকবে পাগলা গারদে!'

'মাই ডিয়ার চাইল্ড,' বিড়বিড় করল মিস প্লুমার, চট করে বন্ধ করে দিল দরজা। দলটা নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে লাগল ওর দিকে। সবার চোখে কেমন ক্ষুধার্ত দৃষ্টি। 'এটা তো পাগলা গারদই...!'

শহরের আতঙ্ক

ভয়ানক এক আতঙ্কে সমস্ত শহরটা যেন ভূতুড়ে নগরীতে পরিণত হয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে ফাঁকা হয়ে যায় রাস্তাঘাট। খুব জরুরী প্রয়োজনে বেরুনো দু'একজন মানুষ ত্রস্ত পায়ে হাঁটা দেয় বাড়ির দিকে। বুকে ভয়—না জানি কী হয়। পুলিস, দু'একটা হুশ করে চলে যাওয়া গাড়ি বা স্কুটার ছাড়া রাজপথে জন মনিষ্যির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া ভার। অফিস ছুটি হলে মানুষের ভিড় আর ধাক্কাধাক্কির সেই চিরন্তন চিত্র এই শহর থেকে অদৃশ্য আজ প্রায় দু'মাস হলো।

সন্ধ্যা নামতে না নামতেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দোকানপাট, খদ্দেরের অভাবে। তা ছাড়া দোকানিরাও কেউ রাতের বেলা ঘরের বার হতে চায় না। জানের ভয় সবারই আছে। কারণ রাত হলেই কার উপর ভয়াল আক্রোশ নিয়ে হানা দেবে নেকড়ে মানব কেউ জানে না।

হ্যাঁ, নেকড়ে মানব। নেকড়ে মানবের ভয়ে একবিংশ শতাব্দীর শুরুর লগ্নে শহরটা কাঁপছে থরথর করে। গত দু'মাসে মোট চোদ্দ জন শিকার হয়েছে নেকড়ে মানবের। গলা ফালাফালা করে ছেঁড়া ছিল প্রতিটি শিকারের। দেখেই বোঝা যায়, কোন ম্যানিয়াকের কাজ। তবে নগরবাসীর ধারণা অন্যরকম। তাদের কারও কারও ধারণা, ম্যানিয়াক নয়, এ নেকড়ে মানবের কাণ্ড। নেকড়ে মানব ছাড়া এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। নেকড়ে মানবকে নাকি বার দুই দেখাও গেছে। তাও শিকারের উপর হামলা করার সময়। প্রত্যক্ষদর্শীরা কসম খেয়ে বলেছে ওটা ছিল বিশালদেহী নেকড়ের মত একটা প্রাণী। তবে

প্রাণীটার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়নি। দুই প্রত্যক্ষদর্শীই বলেছে ওই সময় অন্ধকার ছিল আর জন্তুটা বেশ দূরে ছিল। অন্তত একশো মিটার দূরে ছিল নাকি নেকড়ে মানব। পরিষ্কারভাবে তারা দেখতে পায়নি খুনীকে।

পুলিস বলছে নেকড়ে মানব আসলে স্রেফ কল্পনা। কোন উন্মাদের কাজ এইসব হত্যাকাণ্ড। কিন্তু ব্যাপারটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে সংবাদপত্রগুলো। তারাই গা হিম করা হেডিং ছেপে, রক্তজল করা কাহিনী লিখে মানুষের মনে অজানা নেকড়ে মানব সম্পর্কে প্রবল ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। পত্রিকাঅলারা অবিলম্বে এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। তবে গুজবটা এমনই ছড়িয়েছে যে, মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে ভয়ংকর এক দানব এসেছে তাদের শহরে। রক্তপিপাসু এই খুনীর হাত থেকে কারও রক্ষা নেই। আর ভয়ের চোটে লোকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি করে রাখছে নিজেদেরকে।

তবে একটা ব্যাপার নিয়ে বিভ্রান্ত সকলেই। গল্প উপন্যাসে নেকড়ে মানব সম্পর্কে আছে এরা মানুষ থেকে নেকড়েতে পরিণত হয়। আর এই রূপান্তরটা সাধারণত ঘটে পূর্ণিমা রাতে। কিন্তু এ শহরের হত্যাকাণ্ডগুলোর সাথে পূর্ণিমা রাতের কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।

এ শহরের আতঙ্ক এই নেকড়ে মানব নিজের খেয়াল খুশিমত, যখন ইচ্ছে খুন করে চলেছে। আর এক রাতে একটাই খুন করে সে। আর খুন করার নির্দিষ্ট ক্ষণ রাত হলেও হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটছে বিভিন্ন সময়ে। দশ দিন, বারো দিন বা পনেরো দিন পরে। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ খুন দুটি হলো দশ দিনের ব্যবধানে। এ পর্যন্ত মোট চোদ্দজন মানুষ খুন হয়েছে নেকড়ে মানবের হাতে। গত পনেরো দিন ধরে খুনখারাবীর কোন ঘটনা না ঘটলেও ভয় কমেনি কারও। শহরের প্রতিটি মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ভাবছে এবার বুঝি তার পালা। পনেরোতম শিকার হয়তো তাকেই হতে হবে···

আবু মিয়া বে' দুলকি চালে সন্ধ্যার ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। লোকজন নেই বলে ভালই লাগছে তার। সে যে কাজ করতে যাচ্ছে তাতে মানুষজনের উপস্থিতি একেবারেই কাম্য নয় আবু মিয়ার। কাজটা তাকে সারতে হবে গোপনে এবং সাবধানে। শিকারের চিৎকার কেউ শুনে ফেললেই বিপদ। অবশ্য শহরের যে দশা দেখতে পাচ্ছে আবু তাতে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে কিনা সন্দেহ।

নিখুঁত একটা পরিকল্পনা করেছে কিছুদিন আগে জেল থেকে বেরিয়ে আসা আবু মিয়া। পরিকল্পনা মাফিক কাজটা করতে পারলেই কেল্লা ফতে। বড়লোক হয়ে যাবে আবু। ছিঁচকে চুরি-চামারি করে আর গায়ে গন্ধ লাগাতে হবে না।

নেকড়ে মানবের কথা আবু মিয়া জানে কিনা কে জানে। জানলেও হয়তো পাত্তা দিচ্ছে না। পাত্তা দিলে সন্ধ্যার পরে শহরের রাজপথে দেখা যেত না তাকে। নেকড়ে মানব নয়, আবুর ভয় পুলিস। তাই পুলিস দেখলেই সে চট করে

আশপাশের কোন গলিতে ঢুকে পড়ছে। পুলিসদের তার বিশ্বাস নেই। তার কাঁধে যে ব্যাগটি আছে তাতে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা পুলিসের চোখে পড়লে আর রক্ষে নেই। পুলিস বুঝে ফেলবে সে কী করতে যাচ্ছিল। আবার শ্রীঘরে ঢুকতে হবে তাকে।

মিসেস চৌধুরীর চেহারাটা মনে পড়তে খিক খিক করে হাসল আবু মিয়া। দারুণ এক শিকার বেছে নিয়েছে সে এবার। ধনী, মধ্যবয়স্কা এই মহিলা এক গার্মেন্টস কোম্পানির মালিক। থাকেন শহরের উপকণ্ঠের দোতলা এক বাড়িতে। বাড়িতে এক বুড়ো দারোয়ান আছে। সে সারাদিন ডিউটি দেয়। রাত আটটায় বাড়ি যায় খেতে। ঘণ্টাখানেক পরে আবার ডিউটিতে ফিরে আসে। মিসেস চৌধুরী সম্পর্কে সমস্ত খবরই জোগাড় করেছে আবু। জানে ভদ্রমহিলা একা থাকেন। শহরে এসেছেন ৩/৪ মাস আগে। মাঝে মাঝে পার্টিতে যান। উপর মহলের সাথে তাঁর জানাশোনা যে বেশ ভাল সে কথা আবু মিয়া বুঝেছে খবরের কাগজে এক বিদেশী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ভদ্রমহিলার ছবি দেখে। সেদিন পার্টিতে খুব দামী গহনা পরে গিয়েছিলেন মিসেস চৌধুরী। জেল্লা ফুটে বেরোচ্ছিল গহনা থেকে।

মিসেস চৌধুরীর ঠিকানা জোগাড় করতে তেমন কষ্ট হয়নি আবুর। তারপর কয়েকদিন নজর রেখেছে তাঁর উপর। লক্ষ করেছে শনিবার কোথাও যান না তিনি। আর শনিবার আটটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত ফাঁকা থাকে তাঁর বাড়ি। দারোয়ান ওই সময়ে খেতে যায়। কাজেই এই এক ঘণ্টার মধ্যে কাজ হাসিল করতে হবে আবু মিয়াকে। অনেক কষ্টে, খেটেখুটে প্ল্যানটা করেছে সে। ছিঁচকে চুরি-চামারি আর ভাল লাগে না। তাই বড় ধরনের দাঁও মারার ঝুঁকি নিচ্ছে সে। তবে আবুর বিশ্বাস, তার পরিকল্পনা মাফিকই কাজ এগোবে।

গন্তব্যে পৌঁছে দ্রুত এদিক-ওদিক একবার দেখে নিল আবু মিয়া। মিসেস চৌধুরীর দোতলা বাড়ি শহরের শেষ মাথায় বলে এমনিতেই নির্জন। আর নেকড়ে মানবের ভয়ে এখন তো লোকজনই নেই।

লোহার গেট টপকে ভিতরে ঢুকে পড়ল আবু। সাবধানে এগোল সদর দরজার দিকে। দরজার সামনে একশো পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলছে। হাতে রুমাল পেঁচিয়ে সকেট থেকে বাল্‌ব্‌টা খুলে নিল আবু। সাথে সাথে অন্ধকার হয়ে গেল জায়গাটা। বাল্‌ব্‌টা আস্তে মেঝেতে রাখল সে, কাঁধের ব্যাগ খুলে বের করল একটা পোর্টেব্‌ল্‌ টেপ রেকর্ডার। তারপর কলিংবেল টিপল আবু।

ভিতরে কোথাও মিষ্টি সুরে বেজে উঠল বেল। অপেক্ষা করছে আবু দরজায় কান পেতে। শুনল হেঁটে আসছে কেউ। নিশ্চয়ই মিসেস চৌধুরী। মহিলা দরজার ম্যাজিক আইতে চোখ রাখলেও অন্ধকারে দেখতে পাবেন না আবুকে। বাল্‌ব্‌ খুলে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে আবু।

'কে?' গম্ভীর, আত্মবিশ্বাসী একটা কণ্ঠ ভেসে এল ভিতর থেকে।

আবু সঙ্গে সঙ্গে টেপ-রেকর্ডারের বোতাম টিপল। 'আমি মোনিকা, শীলার বন্ধু। শীলা একটা জিনিস পাঠিয়েছে আপনাকে। ভিতরে আসতে পারি আমি?'

টেপ-রেকর্ডারে মহিলা কণ্ঠ টেপ করে রেখেছে আবু। তবে ওপাশ থেকে মিসেস চৌধুরীর বোঝার উপায় নেই টেপ করা কণ্ঠ ওটা। শীলা তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, জানে আবু। তাই এই কৌশলটা খাটিয়েছে।

'অবশ্যই!' বলে মিসেস চৌধুরী দরজা খুলতে শুরু করলেন।

দরজা খোলার শব্দ হতেই টেপ-রেকর্ডার সরিয়ে ফেলল আবু, ভিতরে ঢোকার জন্য প্রস্তুত।

দরজা খুলে যাচ্ছে, কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল আবু। কবাটের ধাক্কার চোটে ছিটকে পড়ে গেলেন মিসেস চৌধুরী। বিদ্যুৎ গতিতে ভিতরে ঢুকল আবু। পেছনে দরজা বন্ধ করে দিল।

কোমরে গোঁজা রিভলভারটা বের করে মিসেস চৌধুরীর দিকে তাক করল সে। হিস হিস করে বলল, 'কোন শব্দ নয়। বাঁচতে চাইলে চুপ করে থাকুন।'

মিসেস চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল আবুর। ভদ্রমহিলা ঘরের মধ্যেও এত দামী গহনা পরে থাকেন!

মিসেস চৌধুরী ভয় পাননি। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন আবু মিয়ার দিকে। শান্ত গলায় বললেন, 'কী চাও তুমি?'

'বলেছি না কোন কথা নয়,' খ্যাঁক করে উঠল আবু। পিস্তল নাচাল। 'উঠে দাঁড়ান। গহনাগুলো এক এক করে খুলে ফেলুন। তারপর সিন্দুকের চাবিটা দিন আমাকে। চিল্লাচিল্লি করেছেন কী ফুটা করে দেব।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস চৌধুরী। রাগে তাঁর চোখ জ্বলছে। মহিলার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নামতে শুরু করল আবুর। মহিলা এগিয়ে আসছেন ওর দিকে। কটমট করে তাকিয়ে আছেন। ওনার চোখ হঠাৎ এমন হলুদ হয়ে গেল কেন? গলার গভীর থেকে চাপা একটা গর্জন বেরিয়ে এল। শাড়িটা হঠাৎ খসে পড়ল গা থেকে। শরীরের আকৃতি বদলাতে শুরু করেছে।

ভয়ে কাঁপুনি উঠে গেছে আবুর। হাত থেকে পড়ে গেল রিভলভার। চোখের সামনে যে দৃশ্যটা দেখছে, বিশ্বাস হতে চাইছে না। মুখ হাঁ করল চিৎকার দেওয়ার জন্য। ঠিক তখন ধারাল থাবা নিয়ে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন মিসেস চৌধুরী। এক টানে ছিঁড়ে ফেললেন গলা। আবু পনেরোতম শিকার হয়েছে নেকড়ে মানব নয়, নেকড়ে মানবীর!

সাঁঝ বেলা

সন্ধ্যাবেলা, বিছানায় যাবার আগের সময়টা খুব প্রিয় ডোনাল্ডের। সে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে ছুটে যায় পার্কে, টিলার কাছে। ওখানে সূর্যের শেষ রশ্মি ততক্ষণে মিলিয়ে যায়, নেমে আসে আঁধার। আজও সাঁঝ বেলাতে প্রিয় খেলার

জায়গাটিতে গেল ডোনাল্ড।

'হক!' নরম গলায় ডাকল সে। 'হক!'

কেউ জবাব দিল না। ওক গাছের মাঝের ডালে বসা একটি বিষণ্ন পেঁচা সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠল। মাঠ থেকে ভেসে এল ভরত আর দোয়েলের গান; পার্কের এক কোনায় জবুথবু হয়ে বসে থাকা তিনটা ঘুঘু গুঙিয়ে উঠল।

ডোনাল্ড থান্ডার বার্ড বা বজ্র পাখি ঢিবির উপর বসে অপেক্ষা করতে লাগল। রাত ঘনাচ্ছে দ্রুত। পার্কের লম্বা ছায়াগুলো কালো হয়ে উঠছে, প্রায় গ্রাস করে ফেলছে ডোনাল্ডকে। বন্ধ হয়ে গেল ভরত আর দোয়েলের ঐকতান, একটি নাইট হক বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে উঠে গেল সন্ধ্যার নীল আকাশে। রাস্তার কোনার বাতি জ্বলে উঠল তবে ঢিবি বা টিলার কাছে সে আলো পৌঁছুল না।

'হক!' অধৈর্যের সুর ডোনাল্ডের কণ্ঠে। 'আমি জানি তুমি লুকিয়ে রয়েছ। বেরিয়ে এসো।'

এবং হক বরাবরের মত অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল ছায়ার মত। সাঁঝ বেলায় তার চোখ জ্বলছে ধক্ ধক্ করে, যথারীতি চমকে দিল ডোনাল্ডকে।

'তুমি সবসময়ই এভাবে চমকে দাও আমাকে,' অভিযোগ নয়, প্রশংসার গলায় বলল ডোনাল্ড। তারপর খেলা শুরু করে দিল ওরা–ঢিবির চারপাশে কল্পনার ঘোড়া ছোটাল, হকের বিশেষ নাচ নাচল: যুদ্ধ নৃত্য, চন্দ্র নৃত্য, নাইট বার্ড ও থান্ডার বার্ড নৃত্য। প্রায়ই উত্তেজনায় চেঁচাল ডোনাল্ড। পশ্চিমের আকাশ কমলা আর ম্যাজেন্টা রঙ ধরেছে, যে কোন মুহূর্তে বাড়ি থেকে ডাক পড়বে ডোনাল্ডের, হককেও ফিরতে হবে। কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাত না করে দুই শিশু আপন মনে খেলতে লাগল।

টিলার উত্তর দিকটা বেড়া দিয়ে ঘেরা, পার্ককে আলাদা করে রেখেছে লম্বা লন আর দূরের বাড়িটিকে। ওদের মনোযোগ টুকরো হয়ে গেল আর্চার কোনালির কর্কশ কণ্ঠে।

'কী হে, কারস্টেয়ার খোকা, করছ কী?'

'তা দিয়ে তোমার দরকার কী?' মিনমিনে গলায় বলল ডোনাল্ড। আর্চার বাম হাতের আঙুল তুলে শাসাল। 'খবরদার, আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলবে না, ফকিরনির পোলা!' ডান হাতের মুঠোয় একখণ্ড পাথর।

'আমি তো তোমার কিছু করিনি। খামোকা আমার পেছনে লাগছ কেন?' বলল ডোনাল্ড।

আর্চার কোনালিকে সে ভয় পায়। আর্চাররা বড়লোক, তার বাবা-মা তাকে যা চায় তা-ই কিনে দেন। তবু ডোনাল্ডের পেছনে তার লাগা চাই। সে ডোনাল্ডদের উপরে সুযোগ পেলেই মাতব্বরি করে। রাস্তায় দেখলে তাড়া করে; স্কুলে বসে খোঁচায়, যেহেতু আর্চারের বাবা বোর্ড অভ এডুকেশনের হোমরাচোমরা একজন, তাই শিক্ষকরা আর্চার অন্যায় করলেও কিছু বলেন না। এমনকী এই পার্কেও সে ডোনাল্ডদেরকে শান্তিতে খেলতে দেবে না।

'তোমার প্যান্টে ফুটো আছে, কারস্টেয়ার খোকা,' বলল আর্চার।
'ফুটো প্যান্ট নিয়েও খেলা যায়,' বলল ডোনাল্ড।
'না খেলে কী করবে, তোমার আর প্যান্টই তো নেই,' ঠাট্টা করল আর্চার। একটি স্ক্রীন ডোর সজোরে বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল, ডাক দিল কেউ, 'আর্চার।'

আর্চার ঝট্ করে একবার তাকাল বাড়ির দিকে। তারপর ঘুরল এবং হাতের পাথরটা ছুঁড়ে মারল ডোনাল্ডকে লক্ষ্য করে। ডোনাল্ডের পিঠে লাগল পাথর। ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তারপর মুখ তুলে দেখল আর্চার হো হো করে হাসছে। একটা গাছের ডাল মুঠো করে ধরল ডোনাল্ড, ছুঁড়ে মারবে, দেখতে পেল আর্চারের মা বেড়ার দিকে আসছেন।
'আর্চার, এদিকে এসো,' বললেন তিনি। 'মানা করিনি এসব ছেলেপিলের সঙ্গে কখনও খেলবে না?'
ডোনাল্ড হাতের লাঠিটা ছেড়ে দিল, কুঁকড়ে গেছে ভিতরে ভিতরে।
'খেলিনি তো! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম শুধু। কী যে খেলে ও-ই বোঝে।' মা'র সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলল আর্চার। ডোনাল্ড চারপাশে চোখ বুলাল। চলে গেছে হক। জানত যাবে। আর্চার এলেই চলে যায় সে। ডোনাল্ডও আর্চারকে দেখলে পালাতে চায়। কিন্তু আর্চার কোন্নালিকে এত ভয় পায় কেন সে? ওরা বড়লোক বলে?
'ডো-নাল্ড।'
'আসছি।'
সিধে হলো ডোনাল্ড। অন্ধকারে বেহুদা খুঁজল সঙ্গীকে। 'শুভ রাত্রি, হক। আবার কাল দেখা হবে।' বলল সে। ওক গাছের পেঁচাটা আবার চিৎকার দিল আর্তনাদের সুরে, ডোনাল্ড ছুটল বাড়ির উদ্দেশে। ভালুক টিলা, মানুষ টিলা, থান্ডার বার্ড বা বজ্রপাখি টিলা, ওক গাছ ও ম্যাপল এবং এলমের সারি পার হয়ে, ব্যান্ড স্টান্ড ও আইসক্রীমের দোকান ঘেঁষে, রাস্তার ওপারে তাদের বাড়িতে পৌঁছে গেল।
'অনেক খেললি?' মা'র প্রশ্ন।
'হ্যাঁ। ওই শয়তান আর্চারটা আজও বাগড়া দিতে এসেছিল।'
'ওকে একদম পাত্তা দিবি না।'
'দিই না তো। কিন্তু ও আমার গায়ে ঢিল ছুঁড়ে মারে–হক ওর ভয়ে চলে যায়।' অভিযোগের সুরে বলল ডোনাল্ড।
'হকটা কে?'
'ওর কথা তুমি জান। বলেছি তোমাকে।'
'অঃ ওই ছেলেটা যার বাবা ইন্ডিয়ান পোশাক কিনে দিয়েছে।'
'হ্যাঁ,' সোৎসাহে শুরু করল ডোনাল্ড। 'ওর কাছে টমাহকও আছে। ওর নাম নাকি রেড হক। ও চমৎকার গল্প বলতে পারে, নাচতে জানে...'

'কী রকম গল্প?'

'রূপকথার গল্প। যেমন ও বাজপাখির রূপ নিয়ে শিকারে যায়...'

'ছেলেটা তোর চেয়ে বড়?'

'আমার চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু ও যখন পার্কে ঢোকে টেরই পাই না। একটা শব্দও করে না। খাঁটি ইন্ডিয়ানদের মত। আমার পেছনে এসে দাঁড়ালেও বুঝতে পারি না। আর হুট করে এমনভাবে চলে আসে, মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে যাই। ওর মা কখনও ওর নাম ধরে ডাকে না!'

'থাকে কোথায় ছেলেটা?'

'জানি না। ওর বাড়িতে যাইনি কখনও।'

'ঠিক আছে, এখন শুয়ে পড় গে, যা। তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে ছেলেটা ভালই। ওর সঙ্গে খেলতে পারিস। তোর বাবাকে বলব তোর জন্যেও একটা ইন্ডিয়ান ড্রেস বানিয়ে দিতে।'

'সত্যি বলবে, মা? বাবা দেবে?'

'যদি ভাল ছেলে হয়ে থাকিস তো পাবি। দেখি ক্রিসমাসে কিনে দিতে পারি কিনা...'

'আমি খুব ভাল ছেলে হয়ে থাকব, মা। আর আমি তো এমনিতেই ভাল, ভাল না?'

'হুঁ' বলে মা ছেলের কপালে চুমু খেলেন। 'অনেক বকবক হয়েছে এখন ঘুমা।'

'ওকে একটা ইন্ডিয়ান ড্রেস কিনে দেব বলেছি,' ডোনাল্ড ও তার দুই বোন ঘুমানোর অনেক পরে মিসেস কারস্টেয়ার বললেন তাঁর স্বামীকে।

'কীভাবে দেবে জানি না। দিন আনি দিন খাই অবস্থা। ওই ছেলে কীভাবে ওরকম পোশাক জোগাড় করল কে জানে। এ শহরে বড়লোক তো হাতে গোণা। নতুন কোন বড়লোক শহরে এসেছে বলেও তো শুনিনি। আর ছেলেটার নামটাও বড় অদ্ভুত—রেড হক।'

'এটা এক বুড়ো শক সর্দারের ছেলের নাম। তুমি তো জানোই এদিকে কোথায় যেন সর্দারের গ্রাম ছিল। শহরের কোথায় যেন বুড়োর কঙ্কাল পাওয়া গেছিল, না?'

'ও গল্প শহরের সবাই জানে।'

'ওই গল্প শুনে বাচ্চাদের মনে সর্দার সাজার স্বপ্ন দেখা বিচিত্র নয়। আমরা তো আমাদের বাচ্চাটাকে একটা খেলনাও কিনে দিতে পারি না। তার ওপর কোনালি ছোঁড়াটা ওকে ভারী বিরক্ত করে। ছোঁড়াটাকে যদি কেউ শায়েস্তা করতে পারত!' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মিসেস কারস্টেয়ার।

'ওকে শায়েস্তা করার ক্ষমতা এ শহরের কারও নেই। কারণ ছোঁড়ার বাবা-মা খুব প্রভাবশালী। ওদের সঙ্গে আমরা কোনদিনই পেরে উঠব না।'

পরদিন সন্ধ্যায় হক এল একটু আগে আগে। আজ পশ্চিমাকাশে নতুন

চাঁদ উঠেছে, মৃদু আলোতে স্নাত কালো কালো গাছের সারি গোধূলিতে চমৎকার দেখাচ্ছে। ডোনাল্ডের বিশ্বাস তার বাবা-মা ওকে একটি ইন্ডিয়ান ড্রেস কিনে দেবেন। হয়তো হকের মত অমন নিখুঁত, সুন্দর পোশাক হবে না, তবে ইন্ডিয়ান ড্রেস হলেই হলো। তখন আরও মজা করে খেলতে পারবে দু'জনে।

আর্চারও আজ তাড়াতাড়ি চলে এল।

'তুমি কে হে?' বেড়ার গায়ে ঝুঁকে সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করল সে।

'ও আমার বন্ধু,' জানাল ডোনাল্ড।

'ও আমার বন্ধু' মুখ ভেংচালো আর্চার। 'ওর নাম কী?'

'আমি জানি না।'

'ওর নাম বলো, কারস্টেয়ার খোকা, নইলে জানোই তো কী দশা করব।'

'করে দেখাও না,' বুক চিতালো ডোনাল্ড।

'হক' যেন ঘেউ করে উঠল হক।

'এটা কোন নাম হলো,' মন্তব্য করল আর্চার।

'অবশ্যই এটা একটা নাম, আর্চার কোনালি,' বলল ডোনাল্ড।

'না এটা কোন নামের জাত নয়।'

'অবশ্যই নামের জাত।'

'তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো? তুমি তোমার হক বন্ধুকে বলে দাও এ শহরে নতুন কেউ এলে আমাকে ওস্তাদ মানতে হয়।'

হকের গলার গভীর থেকে একটা গর্জন উঠে এল ক্রুদ্ধ কুকুরের মত।

'সাবধানে কথা বলো, আর্চার কোনালি, নয়তো হক রেগে যাবে। আর ওর রাগ বড় সংঘাতিক। তখন তোমার খবর আছে।'

'"তখন তোমার খবর আছে" আবার মুখ ভেংচাল আর্চার। 'ওই ছোকরাও কি তোমার মত ফকির?'

'ফকির হলে দোষ কী?' রাগ ডোনাল্ডের গলায়।

'কী দোষ তা তো জানোই। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, হক? তুমিও ফকির নাকি?'

গরগর করে উঠল হক।

'ফকির না হলে কি আর কারস্টেয়ার খোকার সাথে খেলতে আস।' সে তাকাল ডোনাল্ডের দিকে। 'তোমরা কী খেলছিলে?'

'বৃষ্টি নৃত্য।'

'সেটা আবার কী রকম খেলা?'

'এটা একটা খেলা; হকের খেলা,' জবাব দিল ডোনাল্ড।

'ব্যাঙের মত খালি লাফাও দেখি। এটা কোন খেলা হলো! তোমরা আসলে পাগল, ডোনাল্ড কারস্টেয়ার তোমার হক ছোঁড়াটাও।'

'আমাদের দিকে না তাকালেই পারো।'

'আমার ইচ্ছে আমি তাকাব। এটা আমাদের বাড়ির সীমানা। তোমার ইচ্ছে হলে অন্য কোথাও গিয়ে খেলা করো গে, ফিরেও তাকাব না।'

এমন সময় অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন মিসেস কোনালি, আর্চারকে বগলদাবা করে চলে যাবার আগে, দীর্ঘ একটা মুহূর্ত অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ডোনাল্ড ও হকের দিকে। ভস্ম করা চাউনি দিয়ে বলতে চাইলেন, 'আমার ছেলের সঙ্গে মিশতে এসো না।'

ডোনাল্ড তাকাল হকের দিকে। এবারই প্রথম দৌড়ে পালায়নি সে। হক চেয়ে আছে ডোনাল্ডের দিকে। ওর কালো চোখ জোড়া অদ্ভুত, যেন আগুন আছে ভিতরে, জ্বলছে। হক কিছু বলল না, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে রইল চুপচাপ, যেন বোঝার চেষ্টা করছে কী ভাবছে ডোনাল্ড। 'আমি গরীব হয়ে জন্মেছি,' বলল ডোনাল্ড। 'কিন্তু এটা কি আমার অপরাধ?'

সহানুভূতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল হক। তবে সে একটা বুদ্ধি দিতে পারে। উপজাতিদের বুড়ো জাদুকর একটা খেলা শিখিয়েছে তাকে, জানাল সে। এ খেলায় আর্চারের মত ছেলেদেরকেও শায়েস্তা করা যায়। তোমাকে কল্পনায় দেখতে হবে তুমি বাগে পেয়ে গেছ আর্চারকে, সে নির্ভর করছে তোমার দয়ার উপর; তাকে রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছ মাটিতে, কাঠের গোঁজের সাথে বাঁধা হাত-পা; তারপর কল্পনা করবে তুমি বাজপাখি হয়ে গেছ আর আর্চার ইঁদুর বা এ জাতীয় কিছু একটা, তারপর তুমি আকাশ থেকে নেমে এসে তাকে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলবে। ওরা ভাবলেই পারে যে আর্চার একটা ইঁদুর।

চেহারা থেকে বিষণ্ন ভাবটা কেটে গেল ডোনাল্ডের, কাল্পনিক খেলাটায় মেতে উঠল। সে কল্পনায় দেখল আর্চার কোনালিকে বজ্রপাখি ঢিবির কাছে, মাটিতে ফেলে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং সে ও হক বাজপাখি হয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে তাকে। আর্চার প্রাণ ভিক্ষা চাইছে, অনুনয় করে বলছে জীবনেও সে আর বাঁদরামি করবে না, কিন্তু ওরা তার কথা শুনছে না, ধারাল নখ দিয়ে আঁচড়ে, ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে টুকরো টুকরো করে ফেলছে ছোঁড়াটাকে। এ খেলা কতক্ষণ চলত বলা যায় না, সমাপ্তি ঘটল ডোনাল্ডের মা'র ডাকে।

'শুভ-রাত্রি, হক,' ঘাড় ঘুরিয়ে বলল ডোনাল্ড। দেখল বজ্রপাখি ঢিবির উপর বসে আছে হক—পর মুহূর্তে নেই হয়ে গেল। হকের এই বিদ্যুৎ গতি অন্তর্ধান আবারও পুলকিত করে তুলল ডোনাল্ডকে।

হিংসুকে আর্চার কোনালি ঠিক করেছে ডোনাল্ড ও তার বন্ধুকে এক হাত দেখে নেবে। তার মত বড় লোকের ছেলেকেও ডোনাল্ডের মত ফকিরনীর পোলা পাত্তা দেয় না, ব্যাপারটা ভাবলেই গায়ে জ্বালা ধরে যায় আর্চারের। সঙ্গে আবার জুটিয়েছে আরেকটাকে। রোসো, তোমাদের ইন্ডিয়ান সেজে খেলার মজা দেখাচ্ছি, দাঁতে দাঁত চাপে আর্চার। সে বাপের ইন্ডিয়ান কালেকশন থেকে চুরি করে এনেছে ইন্ডিয়ান তীরের শলা, গায়ে উল্কি এঁকেছে ইচ্ছে মত। গুলতি ছোঁড়ার জন্য নিয়েছে

তীর-ধনুক। সন্ধ্যার আগে আগে বেরিয়ে পড়ল আর্চার, বেড়ার ধারে একটি সিরিনজার (তীব্র গন্ধের সাদা ফুলের ঝোপ) আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। এখান থেকে ঢিবি বা টিলাগুলো পরিষ্কার দেখা যায়।

আর্চার দেখতে পেল ডোনাল্ড আসছে। তবে ডোনাল্ড দেখল না তাকে।

মুখে শয়তানি হাসি ফুটিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল আর্চার।

'হক,' নরম গলায় ডাকল ডোনাল্ড। 'হক!'

কোন জবাব নেই। ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল আর্চার তার শিকারের জন্য। হক এলেই হামলা চালাবে। তবে আজ ঢিবির আলো যেন মুছে গেল তাড়াতাড়ি, অন্ধকার হয়ে গেল জায়গাটা। অথচ তখনও পশ্চিমে, দূর পাহাড়ের উপরে লাল সূর্যটা জ্বলছিল। হঠাৎ হককে দেখা গেল আসতে। সেই অদ্ভুত ইন্ডিয়ান পোশাক পরনে, পিঠে পাখির পালক ও চামড়া।

সাবধানে নড়ে উঠল আর্চার, সতর্কতার সাথে গুলতিতে তীরের সরু ফলা পরাল। তারপর লক্ষ্য স্থির করল। প্রথম ফলাটা ডোনাল্ডের কাঁধে এসে লাগল।

ঘুরে গেল ডোনাল্ড, খুঁজছে আর্চারকে।

দ্বিতীয় ফলা আঘাত হানল চোখের উপরে, চিরে গেল চামড়া, দরদর ধারায় ঝরল রক্ত।

'আর্চার,' গুঙিয়ে উঠল ডোনাল্ড। 'আমাকে মারছ কেন!'

তৃতীয় তীরের ফলা বুকের পাশে আঘাত করল। পড়ে গেল ডোনাল্ড। ব্যথায় হাউমাউ করে কাঁদছে।

'কারস্টেয়ার খোকা ইন্ডিয়ানদের সাথে পারে না,' তারস্বরে চেঁচাল আর্চার। গুলতিতে আরেকটা তীরে ফলা পরিয়ে হকের দিকে ঘুরল। 'হক খোকাও পারে না,' আঁধার ভেদ করে ছুটল তীরের ফলা ঢিবির উপর দিয়ে, সোজা হকের দিকে। সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে ওখানে।

গুলতি দিয়ে পাখি শিকার করে হাত পাকানো আর্চারের লক্ষ্য এবারও অব্যর্থ হলো। ঠিক পেটের মাঝখানটায় লাগল ফলা, হকের শরীরে ঢুকে গেল।

আরও জোরে কেঁদে উঠল ডোনাল্ড। 'হক! হক! তোমার লেগেছে?' কিন্তু কিছু একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটছিল হককে নিয়ে। ওখানে হক দাঁড়িয়ে নেই। দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড একটি পাখি। ডোনাল্ডের মনে পড়ল এ পাখির চামড়া গায়ে দিয়েই হক আসে। মনে হলো চামড়াটা হঠাৎ আয়তনে বেড়ে গিয়ে ঢেকে ফেলেছে হককে। পরের মুহূর্তে পাখিটি লাফ মেরে উঠে পড়ল শূন্যে, পরক্ষণে তীর বেগে ছুটে গেল আর্চারকে লক্ষ্য করে।

আর্চারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটা। ভয়ানক চিৎকার দিল আর্চার।

হাত দিয়ে চোখে চাপা দিল ডোনাল্ড, অন্ধের মত ছুটল বাড়িতে।

মাঝরাতের দিকে ফ্রাঙ্ক কারস্টেয়ার বাড়ি ফিরলেন। তখনও তাঁর স্ত্রী জেগে আছেন।

'মিসেস কোনালিকে অবশেষে সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়েছে,' বললেন

ফ্রাঙ্ক। 'উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিলেন মহিলা।'

'ডোনাল্ডকেও ঘুমের বড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছি। ফ্রাঙ্ক, ব্যাপারটা কী?'.

'ডোনাল্ড বলেনি?'

'বলেছে। বলল বিরাট একটা পাখি, মানুষের চেয়েও বড়। ওরা ডোনাল্ডকে একের পর এক প্রশ্ন করছিল। শেষে আমি থামিয়েছি। প্রতিবার একই জবাব দিয়েছে ডোনাল্ড। আর্চারকে দেখেছ তুমি?'

'যতটুকু সহ্য করা যায়, দেখেছি। গড, হানি–ভয়াবহ একটা দৃশ্য! টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে ওকে–দুটো হাতই ডানার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। মাথাটাও ধড় থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে।' শিউরে উঠলেন তিনি।

'ডোনাল্ডের মাথায় এ রকম গল্প এল কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ফ্রাঙ্ক। 'বোধ হয় সেই ছেলেটা ওকে বলেছে।'

'তা তো বটেই। ওকে বাইরে বেশি যেতে না দেয়াই ভাল,' পার্কের দিকে তাকালেন মি. ফ্রাঙ্ক।

'ডোনাল্ডকে বেশি বেশি ইন্ডিয়ানদের গল্প বলা ঠিক হয়নি। মি. কোনালির কী অবস্থা?'

'উনি তাঁর স্ত্রীর চেয়ে শক্ত আছেন।'

'কিন্তু এ ভয়ঙ্কর ঘটনাটা কী ভাবে ঘটল বুঝতে পারছি না। গুলির শব্দ পেলে?'

'হুঁ। ওরা শিকারে বেরিয়েছে।'

'শিকার? এই সময়ে?'

'পাখি শিকার করছে। বড় পাখি।'

'ঘুমাতে চলো, ফ্রাঙ্ক। অনেক ধকল গেছে। আর সইতে পারছি না। আলোটা নিভিয়ে দেবে? পাখি! মানুষ যে কী?'

'ডাক্তার বলেছেন আর্চারকে একটা পাখি হত্যা করেছে। তার শরীরে আঘাতের দাগগুলো ছিল শিকারী পাখির–তবে আকারে অনেক বড়। নখের আঁচড় পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে গেছেন ডাক্তার। যদিও অস্বাভাবিক বড় দাগ–ডোনাল্ডের বন্ধু, হকের সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ হয়নি তো?–দাগগুলো ছিল বাজ পাখির।'

নিভে গেল আলো।

শেষ রাত

'প্লিজ, ডক্টর,' কেঁপে উঠল মেয়েটির গলা, 'প্লিজ, ডক্টর। আজকে আমার সাথে নার্সকে থেকে যেতে বলুন। আমার ভয় লাগছে, আজ সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটবে মনে হচ্ছে। রাতটা নার্স থাকুক আমার সাথে। এটাই শেষ রাত। কাল তো

চলেই যাচ্ছি। আপনি ওকে থাকতে না বললে আমি আত্মহত্যা করব। হুমকি দিচ্ছি না, সত্যি কাজটা করব।'

নার্স ড. প্যাটারসনের দিকে তাকাল।

হাসলেন ড. প্যাটারসন। 'কিন্তু, ডিয়ার' বললেন তিনি। 'তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? কী হবে তোমার?'

'আমি আপনাকে তা বলতে পারব না। আমার খুব ভয় লাগছে···নার্সকে বলুন আমাকে যেন সে কোন অবস্থাতেই একা ফেলে কোথাও না যায়।'

ডক্টরের ভ্রু কুঁচকে উঠল, নার্সের দিকে তাকালেন।

'ওর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না, ডক্টর,' বলল নার্স।

'আপনাকে আমি বলতে পারব না। তা হলে সে শুনে ফেলবে।'

'সে? কার কথা বলছ তুমি?'

'ড. মরিস।'

'ড. মরিস?' অবাক হলেন প্যাটারসন।

'জ্বী,' প্রায় ফিসফিস করে জবাব দিল নোরা।

ছোট, সাদা ঘরটার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে ভীত দৃষ্টিতে। জানালায় মোটা শিক, বিছানাটা ধপধপে সাদা।

'মেয়েটা আজ বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে,' মন্তব্য করল নার্স।

'তবে ভয় নেই, নোরা। কাল সকালেই তোমার মা চলে আসছেন। বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লে নিজের ক্ষতিই ডেকে আনবে তুমি। আমরা বাধ্য হব আরও ক'টা দিন তোমাকে এখানে আটকে রাখতে।'

নোরা বিছানার ধারে বসল পা ঝুলিয়ে। ওরা আরও ক'টা দিন ওকে আটকে রাখতে চাইবে কেন? এই 'মেন্টাল হোম'-এ সে আছে তিন বছর হয়ে গেল। নোরা'র মা, মিসেস লিটল অবশ্য এটাকে মানসিক হাসপাতাল বলেন না, বলেন প্রাইভেট হোম। প্রায়ই প্রতিবেশীদের কাছে দুঃখের বয়ান শোনান, 'নোরাকে প্রাইভেট হোমে রেখে এসেছি। বেচারী। তবে ডাক্তার বলেছেন ওর অবস্থা আগের চেয়ে ভাল। শিগ্‌গিরি ও আবার ফিরে আসবে আমাদের কাছে।'

'হ্যাঁ, নোরা,' বললেন ড. প্যাটারসন। 'কাল তোমার মা আসবেন। তিনি নিশ্চয়ই ক্লান্ত চোখের অসুস্থ কোন মেয়েকে দেখতে চাইবেন না? আজে বাজে চিন্তা দূর করে দাও মাথা থেকে, নইলে, নার্স যা বলল, এখান থেকে ছাড়পত্র পাবে না। তুমি আবার পাগলামি শুরু করেছ, বুঝতে পারছ সেটা?'

থামলেন ডক্টর। তারপর নার্সকে ইশারায় ডেকে নিলেন দোরগোড়ার বাইরে, চলে গেলেন, হোয়াইট ওয়াশ করা করিডরে। নোরা ওদের ফিসফিসে কণ্ঠ শুনতে পেল। তবে বুঝতে পারছে না কী বলছে। ওরা কি ধারণা করে বসেছে নোরা আবার পাগল হয়ে গেছে? গা শিরশির করে উঠল নোরার। ভয়ে শুকিয়ে গেছে মুখ। ওরা নোরার কথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু নোরা জানে ড. মরিস আজ রাতে আসবে ওর কাছে। সে রকমই বলে গেছে লোকটা। কিন্তু নোরা আর সহ্য করতে

পারছে না–মরিসকে আর সহ্য করতে পারবে না সে। লোকটা যখন চোখ তুলে তাকায় ওর দিকে–উহ, কী ভয়ঙ্কর চাউনি!

এক মহিলার হাসির অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেল নোরা–তারপর ক্রমে চড়া হতে লাগল শব্দটা, একসময় রীতিমত চিৎকারে পরিণত হলো। ম্যানিয়াকের হাসি। খুলে গেল দরজা, ঢুকলেন প্যাটারসন। '১৮ নম্বর আবার শুরু করে দিয়েছে,' গম্ভীর লাগছে তাঁকে। 'দেখে আসি ব্যাপারটা কী।' নার্স ভিতরে ঢুকতে চলে গেলেন প্যাটারসন।

'সত্যি, নোরা, এরকম পাগলামি আর কোরো না,' বিরক্তি প্রকাশ পেল নার্সের কণ্ঠে। 'নাও, ওঠো। শুয়ে পড়ো। আটটা বাজে।'

'নার্স...আপনাকে ঘটনাটা বললে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন? আমার কথা আপনার বিশ্বাস হবে?'

'অনেক হয়েছে নোরা, যথেষ্ট বকেছ। আরও বেশি বকবক করলে ডাক্তারকে খবর দিতে বাধ্য হব আমি। বলব আবার শয়তানী শুরু করেছ। তুমি সত্যি একটা বাঁদর মেয়ে।'

বোবার মত নোরা নার্সের নির্দেশ পালন করে গেল। নাইট ড্রেস পরল, চুল আঁচড়াল। ওদেরকে কিছু বলে লাভ হবে না, বেশ বুঝতে পারছে সে। উল্টো আরও ক'দিন এখানে বন্দি করে রাখবে...মাগো, এই বন্দিশালায় আরও ক'টা রাত কাটানোর কল্পনাই করতে পারে না নোরা। 'ওয়েল, গুডনাইট, নোরা।' দরজার সাথে লাগানো বাতি নিভিয়ে দিল নার্স। 'ঘুমিয়ে পড়ো, ডিয়ার। আমাকে আর জ্বালাতন করবে না, খবরদার।' দড়াম শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে নোরা, চোখ খোলা। ঘুম–তাকে ঘুমাতেই হবে। আগামীকাল আসতে আর বেশি দেরি নেই। কাল সে বাড়ি ফিরবে। কাজেই এখন তাকে ঘুমাতে হবে। নির্জন ঘরে প্রতিধ্বনি তুলল ১৮ নম্বর থেকে ভেসে আসা পাগলি মহিলার খনখনে হাসি। ডাক্তার আর নার্স দু'জনেই বলে গেল সে নাকি বেয়াদবি করেছে। বেয়াদবির শাস্তি ভয়ঙ্কর। না, নোরা আর কোন শাস্তি পেতে চায় না। তাকে এখন ঘুমাতে হবে...সে এখন ঘুমিয়ে পড়বে...আহ্, ঘুম...

ড. প্যাটারসন অস্থির বোধ করছেন। নোরার কথায় কান দেওয়ার কোন মানে হয় না, বুঝতে পারছেন তিনি। তারপরও মনটা কেন জানি খচখচ করছে। কাল নোরার ডিসচার্জ ডে। এ কারণেই হয়তো মেয়েটা বেশি উত্তেজিত হয়ে আছে। কিন্তু ওর আতঙ্কিত চেহারাটা বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। অসুস্থতা নয়, মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে মেয়েটা...প্যাটারসন ভাবলেন মরিসের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে একবার কথা বলবেন কিনা; পরমুহূর্তে নাকচ করে দিলেন চিন্তাটা। লোকটাকে খামোকা বিরক্ত করা হবে। মানসিক রোগীরা এরকম উল্টো পাল্টা কত কথাই তো বলে। সবার কথা সিরিয়াসভাবে নিলে অনেক আগে তাঁকে ওদের দলে সামিল হতে হত। কিন্তু তারপরও–নোরার আর্তনাদ আর ব্যাকুলতার

মাঝে কিছু একটা ছিল। নাহ্, থাক, মরিসকে কিছু বলার দরকার নেই। সে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। নোরা নামের এক মেয়ে তাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছে বললে মরিস নিশ্চয়ই বিব্রতবোধ করবে। ও ওর কাজ নিয়ে থাকুক। ড. প্যাটারসনেরও কাজ আছে। একবার ১৮ নম্বর কেবিনে যেতে হবে। ও ঘরের রোগিণীর পাগলামি বেড়েছে। ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়ে দিলেই চলবে।

হিউ মরিস তার ডেস্কের ঘণ্টা চেপে ধরল, তারপর আবার ঝুঁকে লিখতে শুরু করল। দরজায় কড়া নাড়ল কে যেন।

'ভেতরে এসো,' গম্ভীর গলায় বলল মরিস। ভিতরে ঢুকল সহকারী টড।

'টড,' বলল মরিস। 'তোমাকে ডেকেছি আজ আর তোমার থাকার প্রয়োজন নেই বলতে। তুমি শুতে যেতে পার। আমার প্রচুর কাজ জমে আছে। চাই না কেউ বিরক্ত করুক।'

'ঠিক আছে, সার। আপনার কিছু লাগবে, সার?'

'না, টড। গুডনাইট।'

চলে গেল টড। কান পেতে তার ক্রমশ অপসৃয়মাণ জুতোর শব্দ শুনল মরিস। না, আজ রাতে সত্যি চায় না কেউ তাকে বিরক্ত করুক। টড সাক্ষী দেবে সারা রাত সে তার স্টাডিতে বসে লেখাপড়া করেছে। ডিনার জ্যাকেটটা গায়ে চাপাল মরিস, তার উপর পরে নিল ডাক্তারী, সাদা লিনেন কোট। তারপর হাতে ঢোকাল নরম রাবারের গ্লাভস, ম্যান্টলপিসের উপর রাখা আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল সন্তুষ্টি এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

মধ্য চল্লিশ চলছে মরিসের, লম্বা-চওড়া শক্তপোক্ত গড়ন। কপালের ঠিক উপরে ঘন, কোঁকড়ানো চুল ঢেউ খেলে অদৃশ্য হয়েছে ঘাড়ের পেছনে, দৃঢ় চিবুক, পাথুরে একটা মুখ, ঠোঁট জোড়া নিগ্রোদের মত মোটা! সুদর্শনই বলা চলে মরিসকে–তবে দশ জনের ভিড়ে চোখে পড়ার মত চেহারা নয়, শুধু চোখ জোড়া ছাড়া। তার চোখের রঙ গাঢ় নীল, আণ্ডা সাইজ। সেখানে ফুটে আছে নিখাদ খুনী দৃষ্টি। দেখলেই বোঝা যায় এ লোক ভয়ঙ্কর ফ্যানাটিক। নিন্দুকদের মতে, মরিসের চোখের দিকে তাকালেই নাকি মনে হয় উন্মাদ বা পাগলের দিকে চেয়ে আছি। তবে মেয়ে মহলে মরিসের ওই চোখের দৃষ্টিই 'দারুণ সম্মোহন চাউনি' বলে অভিহিত। তবে বন্ধু বা নিন্দুক, কে কী বলল, তার থোড়াই কেয়ার করে মরিস–সে শুধু একটা জিনিস নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে–তার পেশাদারী কাজ। তার প্রিয় কাজ হলো মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করা। আর আজ রাতে···আজ রাতে, উল্লাসের হাসি ফুটল মরিসের ঠোঁটে, সে নিজের থিওরি পরীক্ষা করে দেখতে যাচ্ছে সম্মোহিত থাকা অবস্থায় সাবজেক্ট কতটুকু শারীরিক যন্ত্রণা বা ব্যথা সহ্য করতে পারে। ঘড়ির দিকে তাকাল মরিস। আরও এক ঘণ্টা পর অভিযানে বেরুবে সে।

চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে নোরা'র ছোট্ট ঘর। অনেকক্ষণ জেগেছিল সে। ভয়ে

আড়ষ্ট নোরা কম্বলের নীচে গুটিসুটি মেরে শুয়ে কান পেতে থেকেছে কখন শোনা যাবে করিডরে সেই চেনা ভারী পায়ের আওয়াজ। সে পালিয়ে যেতে পারত করিডর ধরে, কিন্তু দরজাটা শুধু বাইরে থেকে খোলা যায়। আর তাকে যদি একাকী করিডরে ঘোরাঘুরি করতে দেখে কেউ তা হলে বিপদে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন করিডরে চেনা পায়ের শব্দ শোনা গেল না, পেশিতে ঢিল পড়ল নোরার। খানিক পরে ঘুমিয়ে গেল সে।

মেনিহাম মেন্টাল হোম-এর গেটের বড় ঘড়িটা ঢংঢং করে রাত দুটো বাজার ঘোষণা করল। প্রকাণ্ড দালানটা অন্ধকারে ডুবে আছে, শুধু নাইট ডিউটিতে ব্যস্ত এক নার্সের ঘর থেকে ম্লান কমলা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। মহিলা কখনও বই পড়ছে আবার কখনও সেলাই করছে। তবে মাঝে মাঝে রোগী ডাকাডাকি করলে বিরক্ত হয়ে উঠে যেতে হচ্ছে তাকে।

নিজের ঘরের দরজা সাবধানে খুলল মরিস। জনশূন্য প্যাসেজ। প্রয়োজনে বেড়ালের মত নিঃশব্দে চলাফেরার অভ্যাস আছে ড. মরিসের। করিডরে এসে ১৮ নম্বর রুমের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কোন সাড়াশব্দ নেই। মহিলা নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছে। সে এবার নোরার দরজার সামনে দাঁড়াল। হাত দিয়ে কোটের পকেটে রাখা ছোট্ট স্ক্যালপেলটাতে চাপ দিল। ঠাণ্ডা, ধাতব স্পর্শটা তাকে শিহরিত করে তুলল, মুখে ফুটে উঠল ভয়াল হাসি।

চোখ মেলে তাকাল নোরা। সকাল হয়ে গেছে? জানালার দিকে পাশ ফিরল সে। ক'টা বাজে বোঝা মুশকিল। তবে সকাল হতে বোধহয় বেশি দেরি নেই। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মা চলে আসবে। উদ্ধার করে নিয়ে যাবে তাকে এই নরককুণ্ড থেকে। আহ্, কতদিন পর আবার নিজের বাড়িতে, চিরচেনা পারিপার্শ্বিকতার মাঝে ফিরে যাবে নোরা, ভাবতেই পুলক জাগল শরীরে।

হঠাৎ দরজার বাইরে খুট করে একটা শব্দ বিস্মিত করে তুলল ওকে। আলোর ক্ষীণ একটা রেখা ঢুকল ঘরে, ক্রমে চওড়া হয়ে এল। অবাক নোরা নজর ফেরাতে পারছে না ওদিক থেকে। ড. মরিস। বুঝে গেল নোরা, এবার আর রক্ষা নেই ওর। ইস্, কেন সে নার্সকে ধরে বসল না, জেদ ধরল না প্যাটারসনকে তার সব কথা শুনতে হবে। ড. মরিস সকালবেলা বলে গিয়েছিল, 'এটা শুধু তোমার আর আমার ব্যাপার, মাই ডিয়ার। বুঝতে পেরেছ আমি কি বলতে চাইছি? কাউকে যদি বলে দাও আমি রাতে আসব তা হলে খুন করে ফেলব তোমাকে।'

শিউরে উঠল নোরা মরিসের নীল চোখের অগ্নি দৃষ্টির কথা মনে পড়তে। ওই সময় স্রেফ অসার হয়ে গিয়েছিল নোরা, কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিল। আর এখন লোকটা সত্যি সত্যি চলে এসেছে···

হিউ মরিসের চওড়া কাঁধ আলোক রেখাটা ঢেকে ফেলল। পরো দরজা জুড়ে

দাঁড়িয়েছে সে।

'ড. মরিস,' ফিসফিস করল নোরা।

'চুপ করো, বোকা মেয়ে।'

ভিতরে ঢুকল ডাক্তার, হেলান দিল দরজায়। মৃদু শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। কিন্তু নীরব রূমে বিস্ফোরণের মত শোনাল আওয়াজ। লম্বা দুই কদম ফেলে নোরার সামনে চলে এল সে। ডিম্বাকৃতির ম্লান মুখটা তুলল নোরা, ভয়ার্ত কণ্ঠে আবার বলল, 'ড. মরিস।'

হিউ মরিস বসল নোরার পাশে, ভারী শরীরের চাপে ক্যাঁচকোঁচ করে আপত্তি জানাল বিছানা। হাত চেপে ধরল সে নোরার।

'নোরা–আমার দিকে তাকাও,' নোরার মুখের কাছে নিয়ে এসেছে মরিস নিজের মুখ, তার চওড়া চারকোনা বড় বড় দাঁত পরিষ্কার দেখতে পেল মেয়েটা।

'নোরা···মনে আছে তো আজ সকালে তোমাকে যা বলেছি। কাউকে নিশ্চয়ই বলোনি আজ তোমার কাছে আসব আমি। নাকি বলেছ?'

'না, বলিনি, ডক্টর।'

'আমার চোখের দিকে তাকাও,' নোরার চেপে ধরা হাতে মরিসের বজ্রমুষ্ঠি আরও কঠিন হলো। 'আমি তোমাকে যা যা করতে বলব তুমি তাই করবে–বুঝেছ?' মরিসের গলার স্বরে কোন উত্থান-পতন নেই। 'তুমি কোন ব্যথা অনুভব করবে না–ব্যথা বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই পৃথিবীতে। আমি যা বলি আমার সাথে তাই বলবে। ভীত হবার কিছু নেই। বলো···ভয় পাবার কিছু নেই। ব্যথা বলে কিছু নেই।'

···'ব্যথা বলে কিছু নেই।'

'ব্যথার অস্তিত্ব রয়েছে শুধু কল্পনায়।'

'ব্যথার অস্তিত্ব রয়েছে শুধু কল্পনায়।'

নোরা টের পেল ধীরে ধীরে সে তার চেতনা হারিয়ে ফেলছে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে···ওহ্, কী যে ক্লান্ত সে। আর জেগে থাকতে পারছে না নোরা···কিন্তু ওর মনের একটা অংশ ওকে সাবধান করে দিল এভাবে ঘুমিয়ে পড়া মোটেই উচিত হবে না, খুবই বিপজ্জনক হবে তা, খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু কোন সাবধান বাণীই ও গ্রাহ্য করছে না, শুধু চাইছে ড. মরিস যেন আর তার দিকে তাকিয়ে না থাকে। ওই ভয়ঙ্কর চাউনি ওর মস্তিষ্কের ভিতর গেঁথে যাচ্ছে···চিৎকার করে কেঁদে উঠতে চাইল নোরা–ঠিক তখন দুনিয়া আঁধার হয়ে এল।

মরিস লক্ষ করল নোরার চেহারা ভাবলেশশূন্য হয়ে পড়েছে। খুশিতে ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল সে, ছেড়ে দিল নোরার হাত। অবিচল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে পকেট থেকে ধারাল, ঝকঝকে স্ক্যালপেলটা বের করল ডাক্তার। ঠাণ্ডা ইস্পাত ছোঁয়াল মেয়েটার হাতে, কিন্তু নোরা টের পেয়েছে বলে মনে হলো না।

'নোরা–আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

সাড়া নেই। সাবধানে ছোট্ট যন্ত্রটা তুলল মরিস। চাঁদের ঠাণ্ডা আলো গায়ে লেগে ঝিকিয়ে উঠল ব্লেড। নোরার হাতের পেছনে আস্তে একটা পোচ দিল সে। সাথে সাথে সরু, লাল একটা রেখা ফুটে উঠল ফর্সা চামড়ায়।

'ব্যথার অস্তিত্ব রয়েছে শুধু কল্পনায়,' উল্লাসে গুঙিয়ে উঠল ডাক্তার মরিস। তার এক্সপেরিমেন্টের শুরু ভালই হয়েছে।

হাত নাড়ল নোরা, আস্তে, উদ্দেশ্যবিহীন। হাসছে সে– অর্থহীন, বোকা হাসি। মরিস দেখছে নোরা কী করছে। নোরার হাতটা কিলবিল করে এগিয়ে গেল তার দিকে। খামচে ধরল স্ক্যালপেল। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার। বেশ তো, ভাবল সে, দেখা যাক মেয়েটা এবার কী করে।

'নোরা, তোমার বাম আঙুলে ছোট্ট একটা পোচ দাও–শুনতে পাচ্ছ কী বলছি? ব্যথা বলে কিছু নেই।'

ইতস্তত করছে নোরা। উত্তেজনায় অধীর হয়ে আছে মরিস–সাবজেক্ট যদি ব্যথা না পেয়ে নিজেই নিজের উপর আঘাত হানে···

জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নোরা, চাঁদের আলোয় ওর মুখখানা আলোকিত, শান্ত ভঙ্গিতে ডান হাতে ধরা ছুরিটা তুলল সে। এক মুহূর্ত স্থির থাকল নোরা, তারপর বিদ্যুৎগতিতে গলার কাছে উঠে এল হাত, ধারাল অস্ত্রটা দিয়ে টান মারল গলায়।

'থামো,' উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল মরিস।

আতঙ্কিত মরিসের মনে হলো মেয়েটার দুটো মুখ হয়ে গেছে–দুটো লাল টকটকে হাসি মুখ। একটা মুখ তার গলার কাছে! ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে শরীর মুচড়ে বসে পড়ল নোরা মেঝের উপর, পাতলা নাইট গাউন ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

'নোরা–' হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মরিস। তার মনে হচ্ছে চারপাশে সে শুধু রক্ত দেখতে পাচ্ছে–মেঝেতে, বিছানায়, তার হাতে। পালাতে হবে! সম্বিৎ ফিরে প্রথমে এ ভাবনাটাই এল ডাক্তারের মাথায়। কেউ তাকে ঘর ছেড়ে বেরুতে দেখেনি। স্ক্যালপেলটা নিয়ে নিজের স্টাডিতে ঢুকে পড়তে পারলেই হলো, পরে, যখন এই করুণ দৃশ্যটা আবিষ্কৃত হবে, তার আগেই সে মৃত নোরার হাতে সাধারণ একটা টেবিল নাইফ গুঁজে দিতে পারবে–ব্যাখ্যাটা হবে সাধারণ, নোরার কাছে ছুরিটা লুকানো ছিল, সে ওটা দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

দরজার দিকে পা বাড়াল মরিস এবং সেই মুহূর্তে পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে জমে গেল। এ ঘরের দরজা শুধু বাইরে থেকে খোলে, সে নিজে দরজা বন্ধ করেছে। সকাল না হওয়া পর্যন্ত নিজের ফাঁদে নিজেকেই আটকে থাকতে হবে মরিসকে। মেঝের উপর পড়ে থাকা রক্তাক্ত লাশটার দিকে তাকাল সে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, নিজেকে প্রবোধ দিল ডাক্তার। জানালার দিকে এক কদম এগোল সে, পা পিছলে গেল রক্তে। রক্ত–চারদিকে রক্ত। জানালার দিকে ঝুঁকল মরিস, মোটা মোটা লোহার শিক ওর দিকে তাকিয়ে যেন ভেংচি কাটল।

প্রাণপণ চেষ্টা করল মরিস শিকগুলো বাঁকিয়ে ফেলতে। কিন্তু শক্তির অপচয় হলো খালি খালি। পরিশ্রান্ত মরিস টলতে টলতে ফিরে এল বিছানায়, ধপ্ করে বসে পড়ল। মাথা গরম করলে চলবে না...বারবার কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছে নিজেকে। গোটা ব্যাপারটাই নির্ভর করছে তার নিজের উপর। এমন কিছু করে বসা উচিত হবে না...কিন্তু কিইবা করার আছে তার! মাথার পেছনে হাত বেঁধে শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল মরিস।

বাইরের ঘড়িতে তিনটা বাজার শব্দ হলো। তিনটা বাজে! তাড়াতাড়ি করতে হবে ওকে, নাইট নার্স আর আধা ঘণ্টা পর রাউন্ড দিতে বেরুবে।

এমন সময় মেঝের উপর নিথর শরীরটা নড়ে উঠল...শপথ করে বলতে পারে মরিস সত্যি লাশটাকে নড়তে দেখেছে সে।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো...মাথা ঠাণ্ডা রাখো। মেয়েটা কষ্ট পায়নি–না, সে কষ্ট পেতে পারে না। কারণ ব্যথা বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই।' বিড়বিড় করল মরিস।

একটু পর খেয়াল হলো নিজের সাথে কথা বলছে সে। নিজের গলা শুনে নিজেই ভয় পাচ্ছে? 'এ স্রেফ তোমার কল্পনা। ব্যথা বলে কিছু নেই। ব্যথা বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই–ওহ্, আমাকে বেরুতে দাও! ঈশ্বর বাঁচাও, আমাকে এখান থেকে বের হবার পথ দেখাও!' রীতিমত চিৎকার শুরু করে দিল মরিস, ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেঁচাচ্ছে।

'ব্যথা বলে কিছু নেই, আমি বলছি, ব্যথার অস্তিত্ব শুধু আছে কল্পনায়। আমি প্রমাণ করেছি। ওটা প্রমাণ করেছি। আমাকে বেরুতে দাও!'

দৌড়ে গিয়ে দরজার গায়ে আছড়ে পড়ল মরিস, দমাদম ঘুষি মারতে লাগল কবাটে, হাত কেটে দরদর ধারায় বেরিয়ে এল রক্ত। হঠাৎ করিডরে মানুষের গলা শুনতে পেল সে, ফিসফিস করছে কারা যেন। তারপর এক লোক চেঁচিয়ে উঠল। এ নিশ্চয়ই প্যাটারসন, ভাবল মরিস। তারপর আরও কয়েকটা গলার আওয়াজ–ও ডাক্তাররা আসছে।

'আমাকে বেরুতে দাও–আমি প্রমাণ করেছি। প্রমাণ করেছি আমিই ঠিক। ব্যথা শুধুই ভ্রম মাত্র!' তারস্বরে চেঁচাতে লাগল মরিস।

সাবধানে কেউ তালায় চাবি ঢোকাল, তারপর চট করে একদল লোক ঢুকে পড়ল ভিতরে, পেছনে আতঙ্কিত চেহারা নিয়ে নার্সের দল।

'মরিস!' চারপাশে নজর বুলিয়ে ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল প্যাটারসনের চোখ।

'আমি অবশেষে প্রমাণ করেছি, প্যাটারসন–ব্যথা বলে কিছু নেই।' হিউ মরিস উন্মাদের মত হাসছে। 'বুঝতে পেরেছ আমি কী বলেছি? আমি জিতে গেছি। আমি ব্যথাকে জয় করেছি।'

চিলেকোঠার ডাইনি

বিন্তির চোখের রঙ ওর গায়ের মতই–হলুদ। জান্নাতুল ফেরদৌসকে কঠোরভাবে বলা আছে বিন্তি কিংবা সে যেন কখনোই চিলেকোঠার ঘরে না যায়।

জান্নাতুল ফেরদৌস বাবা-মার সাথে এই প্রথম ওদের গ্রামের বাড়িতে এসেছে। ওরা থাকে আমেরিকায়। বোস্টনে জন্ম জান্নাতুল ফেরদৌস ওরফে জিনুর।

গ্রামের বিশাল বাড়িটি ওদের কেয়ারটেকার দেখাশোনা করে। সে-ই আসলে বলেছে চিলেকোঠার ঘরে যেন জিনু জীবনেও না যায়।

কেন, প্রশ্ন করেছিল জিনু। জবাবে রহস্যময় ভঙ্গিতে হেসে চুপ করে থেকেছে রহমত উল্লাহ।

জান্নাতুল ফেরদৌসের মা মিসেস আমেনা মোহসিন মেয়েকে নিষেধ করে দিয়েছেন চিলেকোঠার ঘরে না ঢুকতে। ব্যাখ্যা দিয়েছেন–শতাব্দী প্রাচীন অন্ধকার ও ঘর চামচিকা আর ধুলো-ময়লায় বোঝাই। ভয় পেতে পারে জিনু। অসুখ বাধিয়ে বসাও বিচিত্র নয়।

চিলেকোঠার ঘর দেখার প্রচুর আগ্রহ জান্নাতুল ফেরদৌসের। তবে বাবা-মা'র খুবই বাধ্য মেয়ে সে। ওঁরা কিছু নিষেধ করলে সে কাজ জীবনেও করবে না জিনু।

কিন্তু আজ নেহায়েত ঠেকায় পড়ে চিলেকোঠার ঘরে আসতে হয়েছে জিনুকে। বিন্তির কারণে।

বিন্তি ভীষণ ছটফটে, দুষ্টু। কোথাও একদণ্ড স্থির থাকতে জানে না। ফুড়ুৎ করে জিনুর কোল থেকে নেমে ছুটেছে চিলেকোঠার ঘরের দিকে। জিনুকেও বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে পেছন পেছন। চিলেকোঠার ঘরের সিঁড়িতে দাঁড়াল জিনু। ব্যস্ত চোখে খুঁজছে বিন্তিকে। সিঁড়ির মাথায় কতগুলো বাক্সের মধ্যে হলদে লেজটাকে দেখতে পেল সে। 'বিন্তি, এদিকে আসো,' নরম গলায় ডাকল জিনু।

চিলেকোঠার ঘরের দরজায় তালা নেই। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে কবাট। একটা হলুদ ঝিলিক দেখল জিনু ফাঁকটার আড়ালে, অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল বিন্তি।

'বিন্তি, চলে আয় বলছি,' এবার গলা চড়ল জিনুর। 'তোর ও ঘরে যাওয়া নিষেধ, জানিস না?'

কোন সাড়া নেই বিন্তির।

'এদিকে এসো, রেহনুমা। বিন্তি আমার কাছে।' মিষ্টি, নরম একটা কণ্ঠ ভেসে এল চিলেকোঠার ঘর থেকে। জমে গেল জিনু। বড় বড় হয়ে গেল চোখ, ঘুরে তাকাল কণ্ঠের উৎসের দিকে।

একটা আরাম কেদারা। দেখলেই বোঝা যায় বহু পুরানো। ওতে বসে মৃদু দুলছেন এক বৃদ্ধা। তাঁর মাথার চুল ধবধবে সাদা, চেহারা ভারী বিষণ্ন। তাঁর কোলে বিন্তি, লেজ গুটিয়ে বসে আছে। দু'জনেই তাকিয়ে আছে বিন্তির দিকে।

'এদিকে এসো,' বৃদ্ধা আস্তে আস্তে হাত বোলাচ্ছেন বিন্তির মাথায়। 'তোমার বেড়াল আমার কাছে। দেখতেই পাচ্ছ। ও আমার বন্ধু হয়ে গেছে, রেহনুমা।' হাসলেন তিনি। তবে তাঁর চোখ হাসছে না। আধো অন্ধকারে মনে হলো জ্বলছে চোখ জোড়া, চাউনিটাও কেমন কঠিন।

'আমার নাম রেহনুমা নয়,' ঢোক গিলল জিনু।

'জানি, জানি সে কথা, সোনা,' দ্রুত বলে উঠলেন তিনি। 'তবে তোমার চেহারা অবিকল রেহনুমার মত। এত মিল তার সাথে তোমার যে তোমাকে রেহনুমাই মনে হচ্ছে। তোমাকে রেহনুমা ডাকলে তুমি কি খুব রাগ করবে? তোমাকে তো আমি রেহনুমাই ভাবছি। তোমরা এ বাড়িতে আসার পর থেকে তোমাকে আমি দেখছি। তুমি যখন বাগানে খেলা কর তখন তোমাকে আমি দেখি। এ জানালা দিয়ে।' ছোট একটা জানালার দিকে হাত তুলে দেখালেন বৃদ্ধা। এত স্বচ্ছ চামড়া, জিনুর মনে হলো চামড়া ভেদ করে জানালার গরাদগুলোও দেখতে পাচ্ছে সে। 'আমি কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি তুমি আসবে। বিশেষ করে আজকের দিনটার জন্যে। আজ যে তুমি এগারোতে পা দিয়েছ, সোনা,' আবার হাসলেন তিনি মিষ্টি করে।

বৃদ্ধা ঠিকই বলেছেন আজ জান্নাতুল ফেরদৌসের এগারোতম জন্মদিন।

'কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, রেহনুমা, সোনা,' বললেন তিনি। 'উঠে এসো। ঘরে এসো। তোমার সাথে কথা বলার জন্য কতদিন ধরে মুখিয়ে আছি আমি।'

চিলেকোঠার ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না জিনুর, ভয় লাগছে। মহিলার আচরণে কেমন অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার আছে। জিনু ভাবল, মাকে এ মহিলার কথা জানাবে।

'এসো!' গোঁ ধরে রইলেন বৃদ্ধা। 'তোমাকে আমার রেহনুমার ছবি দেখাব। দেখবে রেহনুমার সাথে তোমার কত মিল।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু ছবি দেখতে ইচ্ছে করছে না,' বলল জিনু।

'আমি যাই,' হঠাৎ মনে পড়ল কেন এখানে এসেছে সে। 'বিন্তি এসো,' ডাকল বটে, কিন্তু বেড়ালটা একটুও নড়ল না। আগের মত বৃদ্ধার কোলে মুখ গুঁজে বসে রইল। মহিলা তাঁর পরনের সাদা গাউনের পকেট থেকে ছোট একটা ছবি বের করে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন জিনুকে।

'এসো, রেহনুমা। ছবি দেখ। তারপর বিন্তিকে যেতে দেব।' এমনভাবে কথাটা বললেন যেন বিন্তির যাওয়া না যাওয়া তাঁর উপর নির্ভর করছে। বিন্তিকে ধরে রাখার তাঁর কী অধিকার আছে?

না, জান্নাতুল ফেরদৌস উপরে যাবে না। সে সিঁড়ির চার নম্বর ধাপে উঠল। এখান থেকে গলা বাড়িয়ে ছবিটা দেখা যাবে, তারপর বিন্তিকে নিয়ে নেমে যাবে

নীচে। সে আরেক ধাপ সিঁড়ি উঠল।

'হ্যাঁ, এসো সোনা। এসো।'

ছবি না দেখলে অদ্ভুত মহিলা বিন্তিকে ছাড়বেন না বুঝতে পারল জিনু। সর্বশেষ ধাপে উঠে এল ও। মহিলার দিকে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় বয়ে গেল এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া। ছবিটি মহিলার হাত থেকে যেন পিছলে গেল, পাখা মেলল শূন্যে। তারপর ল্যান্ড করল ধুলোভরা মেঝেয়।

জিনু ঝুঁকল মেঝের উপর থেকে ছবিটি কুড়িয়ে নিতে, ঠিক তখন চেয়ার থেকে লাফিয়ে নামল বিন্তি, সিঁড়ির দিকে ছুটল।

ছবিটা হাতে নিয়ে সিধে হলো জিনু। তাকাল শতাব্দীর প্রাচীন রকিং-চেয়ারটার দিকে। চেয়ার খালি। হঠাৎ করেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন বৃদ্ধা।

খোলা দরজাটা বন্ধ করে দিল জিনু। অদ্ভুত, ভাবল ও, গোটা ব্যাপারটা আসলে অদ্ভুত একটা কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। নিজেকে প্রবোধ দিল ও। চিলেকোঠার ঘর নিয়ে নানা কথা ভেবেছি আমি তাই কল্পনায় ওই বুড়ি মহিলাকে দেখেছি।

কিন্তু পুরোটাই যদি কল্পনা হয়ে থাকে তা হলে এ ছবি এল কোত্থেকে!

ছবিটি সাদা-কালো, হলদেটে রং ধরেছে। ছোট একটি মেয়ের ফটোগ্রাফ। অবিকল জান্নাতুল ফেরদৌস ওরফে জিনুর মত দেখতে।

ছবিটা উল্টে দেখল জিনু, পেছনে লেখা রেহনুমা ফেরদৌস, বয়স এগারো।

ছবি নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল জিনু, ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারের উপর রেখে দিল।

আজ জিনুর জন্মদিন। বাবা অবশ্য কাউকে দাওয়াত দেননি। শুধু বিশাল একটি কেক এনেছেন আর মা তাঁর মেয়ের পছন্দের ইলিশ পোলাও রান্না করেছেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষে, বাবা ড্রইংরুমে বসে পাইপ ফুঁকছেন, রান্নাঘরে মাকে বাসন ধোয়ার কাজে সাহায্য করছে জিনু।

ন্যাকড়া দিয়ে একটা প্লেট মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল জিনু, 'রেহনুমা কে, মা?'

মিসেস আমেনা মোহসিন মাংসের বাটি ধুতে ব্যস্ত, মেয়ের প্রশ্ন তেমন খেয়াল করলেন না, হালকা গলায় বললেন, 'জানি না মা। কে সে?'

'আমিও জানি না,' জবাব দিল জিনু। 'তবে এ নামে কেউ বোধহয় ছিল। ওই মেয়েটার একটা ছবি পেয়েছি আমি চিলেকোঠার ঘরে…'

মা ঝট্ করে ঘুরলেন মেয়ের দিকে। 'তোমাকে না ওখানে যেতে মানা করেছি?'

'যেতে চাইনি তো,' মিনমিন করে বলল জিনু। 'বিন্তিটা দৌড়ে গেল। আমাকেও তাই…'

'ঠিক আছে। আর যাবে না। হ্যাঁ, কী বলছিলে যেন?'

'বলছিলাম রেহনুমা ফেরদৌস, বয়স এগারো। মেয়েটার চেহারা অবিকল আমার মত। বয়সও মিলে যায়।'

'রেহনুমা ফেরদৌস?' মা এক মিনিট কী যেন ভাবলেন, 'চিলেকোঠার ঘরে? হুম্‌...ওখানে অবশ্য অনেক পুরনো জিনিসপত্র আছে। তবে কোন ছবি দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।...ফেরদৌস...দাঁড়াও! দাঁড়াও! মনে পড়েছে...ওটা তোমার দাদীর দাদীর মেয়ের নাম। রেহনুমা ফেরদৌস ছিলেন তোমার প্রপিতামহী মানে গ্রেট গ্রান্ডমাদারের মেয়ে। ছোট বেলায় মারা গেছেন তিনি।'

জিনু আরেকটা প্লেট মুছতে লাগল।

'কিন্তু...' বলে চললেন মা, 'ওনার কোন ছবি দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। কোথায় পেলে, ট্রাঙ্কে?'

'মেঝেতে কুড়িয়ে পেয়েছি,' বলল জিনু।

'কোথায় ছবিটা?'

'আমার ঘরে।'

প্লেট মোছা হলে জিনু ছবিটা দেখাল মাকে। মনে মনে আফসোস হচ্ছে এখন ওই বৃদ্ধার কথাও বলতে হবে। যদিও জিনু মনে প্রাণে বিশ্বাস করে স্রেফ কল্পনায় সে বুড়িকে দেখেছে।

'হ্যাঁ,' বললেন মা। 'তোমার দাদীর দাদীর মেয়েই বটে। ওই সময়ে তোলা ছবি। মেয়েটির মৃত্যুর পর তোমার প্রপিতামহী পাগল হয়ে যান। বছরের পর বছর এ বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি আর শুধু রেহনুমা নাম ধরে ডেকেছেন।'

'চিলেকোঠায় একটা রকিং চেয়ার দেখলাম-ওটা বোধ হয় গ্রেট গ্রান্ডমাদারের, তাই না?' জিজ্ঞেস করে জিনু।

'হ্যাঁ। ওটা আমি বিয়ের পর থেকে ওখানে দেখে আসছি।'

'আমার চেহারা কি রেহনুমার মত?'

'অনেকটা তো বটেই,' জবাব দিলেন মা। চোখে চশমা পরে খুঁটিয়ে দেখলেন ছবিটি। তারপর মেয়েকে ওটা ফেরত দিয়ে বললেন, 'ভুল বললাম। অনেকটা নয়, পুরোটাই।' আদর করে মেয়ের রেশম কালো চুল নেড়ে দিলেন। 'তোমরা দু'জনেই খুব সুন্দরী।'

ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি ঘটল ওখানেই। ছবির কথা জিনু ভুলে গেল বেমালুম। তবে, পরদিন বিকেলে সে নিজের ঘরে ঢুকছে, কে যেন দূর থেকে ডাক দিল। 'রেহনুমা-আ!' ঘুরল জিনু, ওর ঘর থেকে চিলেকোঠার ঘরটা পরিষ্কার দেখা যায়। দরজা বন্ধ করে এসেছিল জিনু। কিন্তু এখন ওটা হাট করে খোলা।

বুকের ভিতর যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ল জিনুর। আমি কিছু শুনিনি, নিজেকে প্রবোধ দিল ও। সব আমার কল্পনা। আমি যাব না। আমি আর চিলেকোঠার ঘরে যাব না।

'রেহনুমা-আ-আ!' দূরাগত ডাকটি মৃদু, তবে নরম এবং পরিষ্কার।

যাব না আমি, নিজেকে বোঝাল জিনু, ও ঘরে কেউ নেই। কারও অস্তিত্ব নেই। আমি স্রেফ কল্পনায় বুড়িকে দেখেছি। জিনু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল, চিলেকোঠার দরজা আবার বন্ধ করে দিল। তারপর চলে এল নিজের ঘরে।

জিনু জানত না এ জন্য ওকে কী দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

গভীর ঘুমের স্তর থেকে অস্বস্তি নিয়ে জেগে গেল জান্নাতুল ফেরদৌস, দেখল তার পায়ের কাছে বসা বিন্তি, আঁধারে চোখ জ্বলছে। আর তার পেছনে সাদা গাউন পরা চিলেকোঠার সেই বুড়ি। তবে হাসছেন না তিনি, শ্বাপদের মত জ্বলছে চোখ।

'তোমাকে আমি ডেকেছিলাম,' বললেন তিনি কঠিন গলায়। 'তুমি আসনি। তুমি ভীষণ বেয়াদব। আমরা সারাটা বিকেল তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি। আসনি কেন?'

মহিলার গলার স্বর ভয় পাইয়ে দিল জিনুকে। গায়ের কাঁথাটা চিবুক পর্যন্ত টেনে নিল। আমতা আমতা করে বলল, 'আপনি মানে...'

'মানে মানে করতে হবে না,' হিসিয়ে উঠলেন বৃদ্ধা। 'যখনই ডাকব, চলে আসবে তুমি...'

ভয়ে চোখে জল এসে গেল জিনুর। মাকে ডাকার জন্য হাঁ করল, কিন্তু গলা থেকে আওয়াজই বেরুল না।

হঠাৎ মহিলার চেহারা বদলে গেল, মিষ্টি এবং বিমর্ষ লাগল তাঁকে। 'রেহনুমা, আমার সোনা...আমি তোকে ভয় দেখাতে চাইনি রে, সোনা। তোর অভাব খুব অনুভব করছি আমি। অবশেষে তোর দেখা পেয়েছি। কথা দে, প্রতিদিন তুই আমার কাছে আসবি।'

'নিজের জায়গায় ফিরে যান,' ফুঁপিয়ে উঠল জিনু, 'আপনার ঘরে যান, প্লিজ...'

'যাবরে, মা। যাচ্ছি তো,' শিরা ওঠা হাত বাড়িয়ে জিনুর গাল ছুঁলেন তিনি আদর করে। 'শুধু আমাকে কথা দে, কাল আমার ওখানে আসবি। কথা বলবি এই নিঃসঙ্গ, অসহায় বুড়ির সাথে।'

'কথা দিচ্ছি,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল জিনু।

সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে গেল মহিলা, আর বিন্তি চোখ বুজে পায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে গত রাতের কথা কিছুই মনে থাকল না জিনুর। বাথরূমে ঢুকল মুখ হাত ধুতে। আয়নার দিকে তাকাল এবং চমকে উঠল।

ডানদিকের গালে লালচে তিলের মত একটা দাগ। আঙুল দিয়ে ওখানে ঘষল জিনু। উঠল না দাগটা। হঠাৎ গত রাতের কথা মনে পড়ে গেল। মহিলা ডান গালে হাত ছুঁইয়েছিল। কিন্তু...কিন্তু ওটা তো স্বপ্ন ছিল, তাই না? আসলে মশা কামড় দিয়েছে, তাই ফর্সা গালে লালচে দাগ ফুটে আছে। নিজের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে

নাস্তার টেবিলে গেল জিনু।

মিসেস আমেনা মোহসিন মেয়ের গাল পরীক্ষা করে বললেন, 'মশা কামড়েছে। তোমার ঘরে এ্যারোসল স্প্রে করে দিচ্ছি। আর মশা ঢুকতে পারবে না।'

তবে কাল রাতের স্বপ্নটা নিয়ে সারাটা দিন বিব্রত থাকল জিনু। ঘুমাবার সময় যত এগিয়ে এল, অস্বস্তিটা বেড়ে চলল। একবার ভাবল মাকে বলবে ঘটনাটা। উঁহু, মা শুনলে এমন ঠাট্টা শুরু করে দেবেন, রীতিমত লজ্জায় পড়ে যাবে জিনু। বলবেন হরর গল্প পড়ে হরর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সে। থাক্, মাকে বলতে হবে না।

ঘুমাবার সময়, জীবনে এই প্রথম খাটের তলা, ওয়ার্ড্রোব ইত্যাদি দেখে নিল জান্নাতুল ফেরদৌস। তারপর দরজায় খিল দিল। টেনেটুনে দেখল ঠিকঠাক বন্ধ হয়েছে কিনা।

বিছানায় উঠে পড়ল জিনু, হাত বাড়িয়ে বাতির সুইচ অফ করল। গ্রাম হলেও এদিকে যে ক'টি বাড়ি পল্লী বিদ্যুতের সুবিধে ভোগ করছে, জিনুদের বাড়ি তাদের একটি।

আজ রাতে আমি ঘুমাব না, মনে মনে বলল জিনু। তাই করল সে। এক ঘণ্টা আঁধারে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল।

তারপর ঘুমে চোখ বুজে আসছে, ঠিক তখন ঘটনাটা ঘটল। বাম পায়ে কীসের শক্ত গুঁতো খেয়ে লাফিয়ে উঠল জিনু। ধড়মড় করে উঠে বসল।

বিছানার কিনারায় বসে আছেন সেই বৃদ্ধা। হাসছেন। চাঁদের আলোয় ঘরের ভিতরটা বেশ পরিষ্কার। মহিলার চোখ জ্বলছে বিস্তির মত, শক্ত করে ধরে আছেন জিনুর পায়ের গোড়ালি।

বিস্তি তাঁর পাশেই, ভয়ানক লাগছে ওকে। শরীরটা ফুলে যেন দ্বিগুণ হয়েছে। হাঁ করা মুখ, ধবধবে সাদা দাঁত বের হয়ে আছে।

জিনু শুনল মহিলা বলছেন ফিসফিস করে...এবার আমার সময়...রেহনুমা...তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ...বলেছিলে আসবে...আসনি...আমাকে তাই আসতে হয়েছে...আমি তোমাকে আজ নিয়ে যাব আমার সাথে...

ধস্তাধস্তি করল জিনু, কিন্তু বুড়ির গায়ে কী শক্তি, অবলীলায় ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন বিছানার প্রান্তে। 'আমি তোমাকে শিক্ষা দেব...তোমার কত বড় সাহস...কথা দিয়ে কথা রাখ না...'

জিনু গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে গোঙানি ছাড়া কিছুই বেরুল না। প্রাণপণ চেষ্টা করছে বুড়ির বজ্রমুষ্ঠি থেকে পা ছুটিয়ে নেওয়ার।

'আমরা এবার চলে যাব...আমরা তিনজন...সারাজীবনের জন্যে...আমার রেহনুমা...'

হাত বাড়াল জিনু কিছু একটা আঁকড়ে ধরার জন্য। কিন্তু হাতে কিছুই বাধল

না, ওকে বুড়ি ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে চলেছেন···

এবার তিনি জিনুর চুল ধরলেন মুঠো করে। ব্যথায় গায়ে আগুন ধরে গেল ওর। প্রাণপণ শক্তিতে বুড়ির বুকে দু'হাত দিয়ে রাম ধাক্কা মারল জিনু। ফুসফুস থেকে সমস্ত দম বেরিয়ে যাবার মত হিস্‌স্‌ শব্দ শুনল ও। বন্ধন মুক্ত হয়ে গেল জিনু।

দ্রুত গড়ান দিয়ে মেঝেতে নামল জিনু, আর তখন বিন্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর, নখ বসে গেল কাঁধে। তীব্র ব্যথাটা যেন ফুসফুসে শক্তি জোগাল জিনুর, মুখ হাঁ করল ও, গলার গভীর থেকে বেরিয়ে এল চিৎকার। বিন্তিকে দু'হাতে ধরল ও, ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। ওর কব্জি চেপে ধরল শুকনো, খটখটে একটা হাত। পাঁই করে ঘুরল জিনু। ভৌতিক বুড়ি, দাঁতহীন মাড়ি বেরিয়ে পড়েছে, ভয়ানক লাগছে দেখতে। ঠিক যেন একটা ডাইনি।

ওদিকে বন্ধ দরজায় ক্রমাগত দমাদম করাঘাত পড়ছে। জিনুর মা'র উদ্বিগ্ন কণ্ঠ ভেসে এল, 'কী হয়েছে, জিনু? দরজা বন্ধ করে রেখেছ কেন···জিনু?'

ডাইনি বুড়ির কী শক্তি! জিনুকে হাত মুচড়ে জানালার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জিনু আবার চিৎকার দিল। বুড়ির গলা সাপের মত হিসহিস করে উঠল কানের পাশে, 'তোকে আসতেই হবে···আজ থেকে তুই আমার রেহনুমা···আমার···'

হ্যাঁচকা টানে জিনু ছিটকে পড়ল জানালার উপর, খট করে খুলে গেল জানালা। টের পেল ওকে জানালা দিয়ে টেনে বের করার চেষ্টা করছে বুড়ি। জানালার ফ্রেম ধরে ফেলল জিনু, প্রাণপণে ঝুলে রইল···

এমন সময় ভেঙে পড়ল বেডরুমের দরজা, জ্বলে উঠল আলো। জানালার ফ্রেম ছেড়ে দিল জিনু, পড়ে গেল মেঝেতে। ওর বাবা-মা ছুটে গেলেন ওর দিকে।

এরপরের ঘটনাগুলো যেন ঘোরের মধ্যে ঘটতে লাগল। কাঁদছে জিনু, ওর মা কাঁধে বিন্তির নখের আঁচড় পরিষ্কার করে দিচ্ছেন, ব্যান্ডেজ করছেন, ফোঁপাতে ফোঁপাতে জিনু বলছে, 'না, বিন্তিকে মেরো না। ওর কোন দোষ নেই।' বিন্তি ভয়ের চোটে ওয়ার্ড্রোবের আড়ালে পালিয়েছে।

অনেক সময় লাগল জিনুর ধাতস্থ হতে। তারপর বলল, 'সব কিছুর নষ্টের গোড়া চিলেকোঠার রকিং-চেয়ারটা···ওটা পুড়িয়ে ফেল···' তারপর সে বাবা-মাকে সমস্ত ঘটনা বলল।

বাবা চিলেকোঠা থেকে আরাম-কেদারাটা নিয়ে এলেন। কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলেন। দাউ দাউ জ্বলে উঠল আগুন। সে দৃশ্য জিনু দেখল স্থির চোখে, তার পায়ের নীচে বসে থাকল বিন্তি।

সে-ও দেখল শতাব্দী প্রাচীন আরাম-কেদারাটাকে গ্রাস করছে আগুনের লেলিহান শিখা, পুড়ে যাচ্ছে ওটা।

প্রফেসরের প্রতিহিংসা

'গুড ইভনিং, মাই ট্রেজার।'

'গুড ইভনিং, ডিয়ার।' প্রফেসরের স্ত্রী ফায়ার প্লেসের পাশের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, চুমু খেলো স্বামীকে। 'আজ অনেক ধকল গেছে না?'

'হ্যাঁ। সারাটা দিন ল্যাবরেটরিতেই কাটাতে হলো। কী করব, ডুম্বা গাধাটা কিছু বোঝে না–সব হাতে কলমে শিখিয়ে দিতে হচ্ছে…'

'নতুন লোকটার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ,' শুকনো গলায় জবাব দিলেন প্রফেসর। 'তুমি আমার কাজের ব্যাপারে তো কখনও আগ্রহ দেখাও না। আজ এত উৎসাহ দেখাচ্ছ। ব্যাপার কী?'

'তুমি যে কী! সবকিছুর উল্টো মানে করা চাই। আমার কি তোমার এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে আগ্রহ নেই? খুব আছে। প্রায়ই শুনি তুমি তোমার অ্যাসিস্টান্ট বদল করছ। এত ঘনঘন কাজটা করো তুমি, কারও নামও মনে থাকে না।'

প্রফেসরের স্ত্রী খুবই সুন্দরী, মাখনের মত ত্বক, বেশিরভাগ ভিয়েনিজ মেয়েদের যা জন্মগত বৈশিষ্ট্য; হাসি হাসি মুখ করে কথাগুলো বললেও স্বামীর আচরণে সে কষ্ট পেয়েছে। যদিও চেহারায় ভাবটা ফুটে উঠতে দিল না।

'কিছু মনে কোরো না,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন প্রফেসর। 'তোমার সুন্দর মাথাটা এসব বিরক্তিকর জিনিস নিয়ে না ঘামালেও চলবে।' তাঁর গলার স্বর ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এল, গ্রেটা জানে প্রফেসর তাকে নিয়ে এ মুহূর্তে ভাবছে না, তাঁর মন চলে গেছে দূরে, নিজের সাজানো-গোছানো ল্যাবরেটরিতে, সেখানে টেস্টটিউব আর নানা ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে প্রতিদিন বিভিন্ন ডিজিজের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন প্রফেসর।

'চা খাবে না, লিও?' দরজার দিকে পা বাড়িয়েছেন প্রফেসর, পেছন থেকে ডাকল গ্রেটা। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বুড়ো দেখায় প্রফেসরকে, একটু টলে উঠলেন। তাঁর চুল পাতলা হতে শুরু করেছে। ঘুরে দাঁড়ালেন এক মুহূর্তের জন্য।

'নো, থ্যাংকিউ, ডিয়ার। ডিনারের আগে প্রচুর কাজ করতে হবে--আমি পড়ার ঘরে যাচ্ছি। কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে।'

আবার নিজের চেয়ারে বসে পড়ল গ্রেটা, অসমাপ্ত বইটি তুলে নিল হাতে। 'আমি তোমাকে বিরক্ত করব না, লিও…'

বেশি কড়া কথা বলা হয়ে গেছে বুঝতে পেরে প্রফেসর অনুতপ্ত হলেন। স্ত্রীকে তোয়াজ করার সুরে বললেন, 'আগুনের আলোয় তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে, গ্রেটা।' একটু বিরতি দিলেন। 'আসলে তোমার বোঝা উচিত…' শুরু করতে গিয়ে নিজের উপরেই যেন বিরক্ত হয়ে উঠলেন তিনি কথাটা বলা উচিত হয়নি ভেবে।

তবু শেষ করলেন এই বলে, 'একজন বিজ্ঞানীর স্ত্রীকে সবকিছু বুঝে নিতে হয়।'

সশব্দে বন্ধ হলো দরজা। মৃদু হাসল গ্রেটা। বিজ্ঞানীর স্ত্রী...কাজেই তার অসুখী হবার অধিকার নেই। লিওকে অবশ্য মডেল হাজব্যান্ডই বলা চলে। স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসেন। গ্রেটার ব্যক্তি জীবন বা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কখনও নাক গলান না। তবে প্রফেসর স্ত্রীকে প্রচুর সময় দিয়েও থাকেন। প্রফেসর যে সব কাজ করে বিখ্যাত হয়েছেন, গ্রেটা তাঁর সব কাজেই অংশীদার হয়েছে...কাঠ পোড়ার চরচর আওয়াজ হচ্ছে, উষ্ণ তাপে ভরে আছে ঘর। পড়ার মধ্যে ডুবে গেল গ্রেটা।

সাড়ে সাতটার দিকে বই থেকে চোখ তুলল সে, ডিনারে যেতে হবে ভাবতে বিতৃষ্ণা লাগল। প্রফেসরের সাথে ডিনার করতে তেমন ভাল লাগে না ওর। সারাদিন কী করেছে সে ফিরিস্তি দিতে হয়, কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে দু'একটা গল্প বলে, অথবা কী বই পড়েছে তা নিয়ে মন্তব্য করে। প্রফেসর গম্ভীর চেহারা নিয়ে গ্রেটার গল্প শোনেন–মাঝে মাঝে এমন সব মন্তব্য করেন, জ্বালা ধরে যায় গায়ে। তারপর চুপ হয়ে যায় গ্রেটা, ডিনার পর্বের সমাপ্তি ঘটে নীরবে।

হলঘর পার হয়ে এসেছে, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। নিজেই ফোন ধরল গ্রেটা।

'হ্যালো?'

'গ্রেটা!'

'কে বলছেন?'

'ফ্রাঞ্জ!'

ফ্রাঞ্জ...কতদিন ফ্রাঞ্জের সাথে দেখা হয় না–দশ বছর তো হবেই। ভেবেছিল ফ্রাঞ্জ আমেরিকায়। ফ্রাঞ্জকে নিয়ে ভাবছে কেন সে। এতদিন পর ব্যাপারটা হাস্যকর নয় কি? কিন্তু টের পাচ্ছে গ্রেটা, ওর গালে লাল ছোপ ধরেছে। ওর কণ্ঠ শুনলেই মনে রোমাঞ্চ জাগত। তবে এখন কেমন অচেনা লাগছে। 'মাই ডিয়ার, কেমন আছ তুমি?' ইচ্ছে করেই গলার স্বর নিরুত্তাপ রাখল গ্রেটা। 'ভিয়েনায় কবে এসেছ?'

'আজ সকালে। তোমার ঠিকানা খুঁজে পেতে জান বেরিয়ে গেছে। গ্রেটা, তোমার সাথে দেখা করতে পারি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই–তুমি কতদিন আছ এখানে?'

শুনল হাসছে ফ্রাঞ্জ। 'এত ফর্মাল হয়ো না–তা হলে ভয় পেয়ে ফোন ছেড়ে দেব। আছি অনেকদিন। তবে আজ রাতেই দেখা করতে চাই।'

'না। আজ রাতে কী করে স–'

আবার হাসতে শুরু করেছে ফ্রাঞ্জ, 'তোমরা ডিনার করো ক'টায়?'

'সাড়ে আটটার দিকে...কিন্তু আমার স্বামী...'

'আমি তাঁর সাথে পরিচিত হতে চাই–আমি ডিনারের সময় হাজির হয়ে যাব।' আবার হাসি, তারপর ফোন রেখে দিল ফ্রাঞ্জ।

চিন্তিত ভঙ্গিতে রিসিভার নামিয়ে রাখল গ্রেটা। লিও কী বলবে? বিয়ের আগে

যে পুরুষ তার বন্ধু ছিল তাকে দেখে প্রফেসরের কীরকম প্রতিক্রিয়া হবে বুঝতে পারছে না গ্রেটা। তবে ফ্রাঞ্জ অন্যরকম মানুষ–প্রফেসর নিশ্চয়ই ওর সাথে ভাল ব্যবহার করবেন। স্বামী জেলাস হয়ে উঠবে সেটা গ্রেটা চিন্তাও করে না। তবে ভয় পাচ্ছে ভেবে সন্ধ্যাবেলায় অতিথির আগমনে প্রফেসর বিরক্ত হতে পারেন। ফোনে ফ্রাঞ্জকে ঠিক আগের মতই মনে হয়েছে–আবেগী, চঞ্চল, কোন জবাবে 'না' শুনতে রাজি নয়, সবচে' সিরিয়াস আপত্তির বিষয়টিকেও হেসে উড়িয়ে দিতে জানে।

বিয়ের আগের স্মৃতি নাড়া দিল মনে। তখন অস্ট্রিয়ায় দুর্ভিক্ষ চলছে। রুটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে–মাংসের কথা কল্পনাও করা যায় না। তবে ভিয়েনাবাসী বিনোদন থেকে বঞ্চিত হতে রাজি ছিল না। ক্যাফেগুলো ভরা থাকত সবসময়, এক টুকরো রুটির চেয়েও সস্তা ছিল ওয়াইনের বোতল। খোলা ক্যারিজে চড়ে গ্রিনজিং-এ গিয়েছিল গ্রেটা ফ্রাঞ্জের সাথে। সে রাতটার কথা ভুলবে না কোনদিন। খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল সে রাতে, চাঁদটাকে ভীষণ বিষণ্ন লাগছিল–তারাগুলোকে মনে হচ্ছিল খুব কাছে। পরদিন আমেরিকা চলে যাবার কথা ফ্রাঞ্জের। লাইলাক গাছে ঘেরা এক ক্যাফেতে বসে ছিল ওরা দু'জন, মজাদার চুটকি বলছিল, হাসছিল, স্মৃতিচারণ করছিল ছেলেবেলার। সময়টা চমৎকার উপভোগ করেছে গ্রেটা, মনে হচ্ছিল প্রেমে পড়ে গেছে ও ফ্রাঞ্জের; পেটে খিদে নিয়ে মদ গেলার কারণে হালকা মাথা, সারারাত নেচেছে দু'জনে। পরদিন চলে যায় ফ্রাঞ্জ, জীবনটা ধূসর আর খালি মনে হতে থাকে গ্রেটার। কিন্তু ওটুকুই...এ নিয়ে প্রফেসরের মাইন্ড করার কিছু নেই। সুন্দর একটি বন্ধুত্বের সমাপ্তি ঘটেছে অশ্রুপাতহীন বিদায়ের মাধ্যমে। এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু তারপরও নার্ভাস লাগছে গ্রেটার। দ্বিধা নিয়েই স্বামীর ঘরের দরজায় টোকা দিল সে।

'লিও, ডিয়ার, তোমার সাথে একটু কথা বলতে পারি?'

ডেস্কের উপর থেকে মুখ তুলে চাইলেন প্রফেসর, স্ত্রীকে দেখে হাসলেন, কপাল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল বিরক্তির ভাঁজ।

'অবশ্যই, গ্রেটা।'

সরাসরি প্রফেসরের মুখের দিকে তাকাল গ্রেটা বুকে সাহস নিয়ে।

'ফ্রাঞ্জ আর্কো এসেছে–ওকে আজ রাতে আমাদের সাথে ডিনার করতে বলেছি।'

প্রফেসর চটেমটে কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেলেন, এক মুহূর্তের জন্য বিস্মিত দেখাল তাঁকে, যেন নামটা মনে করতে পারছেন না; শেষে বললেন, 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে–তোমার এক পুরানো বন্ধু। হুট করে আজকেই বলে ফেললে?'

হাসার চেষ্টা করল গ্রেটা, স্বামীর সামনে সহজ হতে পারছে না কিছুতেই। 'হ্যাঁ। হুট করেই দাওয়াত দিয়ে দিলাম।...ইয়ে মানে, ও আমার খুব ভাল বন্ধু, জানোই তো!'

'তা হলে তো তাকে দাওয়াত দেয়াই যায়,' জবাব দিলেন প্রফেসর, আবার কলম তুলে নিলেন। 'তোমার এই বন্ধুটি সম্পর্কে এত কথা শুনেছি যে পরিচিত

হবার ইচ্ছে জাগছে মনে।' আবার কলম চলতে শুরু করেছে তাঁর হাতে।

'চাকরগুলোকে খবরটা জানিয়ে দেয়া দরকার,' জাতীয় কিছু কথা বিড়বিড় করে বলতে বলতে চলে এল গ্রেটা।

তবে ডিনার টেবিলে অপ্রীতিকর কিছু ঘটল না। প্রফেসর শুকনো কিছু রসিকতা শোনালেন যা শুনে হাসির বদলে কান্না পায়। তবু হো হো করে দাঁত বের করতে হলো। তবে হাসিখুশি ফ্রাঞ্জ একাই মাতিয়ে রাখল। ফ্রাঞ্জের বয়স বেড়েছে, চেহারা থেকে সে ছাপ লুকোতে পারেনি। আমেরিকা নিয়েই বেশির ভাগ গল্প করল ফ্রাঞ্জ। মজার মজার সেসব গল্প শুনে হাসির বন্যা বয়ে গেল টেবিলে। ফ্রাঞ্জ প্রচুর ওয়াইন গিলেছে, চোখ মুখ জ্বলজ্বল করছে। একটু পরে দুই পুরুষকে গল্প করার সুযোগ দিয়ে চলে গেল গ্রেটা।

ড্রইংরুমে ঢুকে ফায়ার প্লেসের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল গ্রেটা। বদলে গেছে ফ্রাঞ্জ। সৈনিকের জায়গা দখল করেছে ব্যবসায়ী, যে গল্প বলতে ভালবাসে এবং সে গল্পের হিরো সে নিজেই। প্রফেসর ওর জোকস খুব একটা পছন্দ করেননি, চেহারা দেখে বোঝা গেছে। তবে এ জন্য লিওকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। একটু পরে গ্রেটার সাথে যোগ দিল ওরা দু'জন।

'গ্রেটা, ডিয়ার, তোমার বন্ধু এতদিন পরে এসেছে। ওকে তোমার একটু সময় দেয়া উচিত। আমি ল্যাবরেটরিতে যাচ্ছি।'

'যাবেন না, প্রফেসর–এখনও শিকাগোর গুণ্ডাদের হাতে পড়ার গল্পই বলা হয়নি!'

'দুঃখিত, আর্কো। আমার জরুরী কাজ পড়ে আছে। গ্রেটার সাথে গল্প করুন–আর ব্রান্ডির বোতল আপনার নাগালের মধ্যেই রইল।' স্ত্রীকে মৃদু একটা হাসি দিয়ে চলে গেলেন প্রফেসর।

সোফায়, গ্রেটার পাশে এসে বসল ফ্রাঞ্জ, লম্বা পা জোড়া বাড়িয়ে দিল আগুনের দিকে। তারপর গ্রেটাকে কিছু আমেরিকান জোকস শোনাল। সেই সাথে মুক্তভাবে চলল মদ্যপান। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফ্রাঞ্জের চোখের রঙ গোলাপি হয়ে উঠল, ফুলেও উঠেছে খানিকটা। গ্রেটার হাতে হাত রাখল সে, গাঢ় গলায় বলল, 'তারপর, আমার ছোট্ট গ্রেটার দিনকাল কাটছে কেমন?' শ্রাগ করল গ্রেটা।

'ভাল নয়?'

'অবশ্যই ভাল,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল গ্রেটা।

'কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে না।'

'হ্যাঁ, আমি সুখে আছি,' উঠে দাঁড়াল গ্রেটা, হেলান দিল ম্যান্টলপিসের গায়ে। 'এ ধরনের প্রশ্ন করার অধিকার তোমার নেই, ফ্রাঞ্জ।'

'নেই?' গর্জে উঠল ফ্রাঞ্জ, দাঁড়াতে গিয়ে টলে উঠল। 'একসময় কিন্তু ছিল, গ্রেটা।'

ফ্রাঞ্জের বলার ধরন পছন্দ হলো না গ্রেটার, ও সরে যাচ্ছে, খপ করে ফ্রাঞ্জ ধরে বসল, গায়ের সাথে চেপে রাখল শক্ত হাতে। মুখ দিয়ে ভক ভক করে মদের

গন্ধ বেরুচ্ছে। গ্রেটা ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল বাঁধন মুক্ত হতে।

'না, না,' বলতে বলতে চুমু খেল ফ্রাঞ্জ গ্রেটাকে। গ্রেটার ইচ্ছে করল চিৎকার করে ওঠে, কিন্তু পারল না। ওরা কেউ শুনতে পেল না দরজাটা এক মুহূর্তের জন্য খুলে গিয়ে আবার বন্ধ হয়ে গেছে। অবশেষে বন্ধনমুক্ত হলো গ্রেটা। ফ্রাঞ্জ বোকার মত তাকিয়ে রইল গ্রেটার দিকে, অল্প অল্প টলছে।

'চলে যাও, প্লিজ,' যতটা সম্ভব কর্তৃত্ব ফুটিয়ে তুলল গ্রেটা গলায়। 'আ-আমি আর তোমার চেহারা দেখতে চাই না।'

হেসে উঠল ফ্রাঞ্জ, যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। ঠিক তখন হলঘরের দরজা আবার খুলে গেল, হাসিমুখে ভিতরে ঢুকলেন প্রফেসর। দ্রুত স্বামীর পাশে চলে এল গ্রেটা, একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে, যেন নিরাপত্তা খুঁজছে।

'কী ব্যাপার, গ্রেটা–তোমাকে এত আপসেট লাগছে কেন? পুরানো দিনের স্মৃতি খুব বেশি কষ্ট দিয়েছে বুঝি?'

'না, ঠিক তা নয়,' আড়ষ্ট হাসল গ্রেটা। 'ফ্রাঞ্জ চলে যাচ্ছে...'

'এত তাড়াতাড়ি? না, না তা কী করে হয়। আরেকটু ব্রান্ডি চলবে, আর্কো?'

মাথা দোলাল ফ্রাঞ্জ–প্রফেসর ঘরে ঢোকার পর থেকে একটি কথাও বলেনি। দু'জনে নীরবে মদ পান করে চলল।

'এত নীরব কেন, আর্কো? শরীর খারাপ?'

'আমি ঠিকই আছি, প্রফেসর। এখন ওঠা দরকার।'

'সে কী, বন্ধু। এত তাড়াতাড়ি আপনাকে উঠতেই দেব না। গ্রেটাও নিশ্চয়ই হতাশ হবে।'

'থাক, লিও। ওকে যেতে দাও। জার্নির জন্যে ও বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

'ঠিক, প্রফেসর। আমার মাথা ধরেছে।'

'মাথা ধরেছে?' চট করে বললেন প্রফেসর। 'কোন চিন্তা নেই–আমি আসছি এখুনি। গ্রেটা, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অতিথিকে যেতে দিও না।'

'কোথায় যাচ্ছ, লিও?' জিজ্ঞেস করল গ্রেটা, হঠাৎ ভয় পেয়েছে ও।

'তোমার বন্ধুর মাথা ধরার ওষুধ আনতে,' বলে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর।

ফ্রাঞ্জের দিকে ফিরল গ্রেটা। 'তুমি এখুনি চলে যাও–ওর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। প্রফেসরের আচরণ আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।'

মাতালের মত হাসল ফ্রাঞ্জ, 'প্রফেসর আমার জন্যে বেশি বেশি দুশ্চিন্তা করছেন।' একটু বিরতির পরে আবার বলল, 'আমি খুবই দুঃখিত, গ্রেটা, আসলে...'

'ঠিক আছে,' বলল গ্রেটা। 'যা হবার হয়েছে। এখন চলে যাও।'

দরজার দিকে পা বাড়াল ফ্রাঞ্জ কিন্তু যেতে পারল না। তার আগেই ভিতরে

ঢুকে পড়েছেন প্রফেসর। অশুভ হাসি হেসে এগিয়ে এলেন তিনি। 'দুঃখিত, আর্কো,' বললেন প্রফেসর। 'আমার কাছে অ্যাসপিরিন ছিল। ফুরিয়ে গেছে।'

'আমার কাছে আছে,' বলল গ্রেটা। 'নিয়ে আসি।' পা বাড়াল সে, তাকে বাধা দিলেন প্রফেসর।

'তোমাকে কষ্ট করে ওপরে যেতে হবে না, মাই ট্রেজার। আর্কো যদি কিছু মনে না করে তা হলে ওকে একটা ইনজেকশন দিতে চাই। মাথা ব্যথা নিমিষে দূর হয়ে যাবে।' হাতের সিরিঞ্জটা দেখিয়ে বললেন তিনি।

দু'জনেই দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ, প্রফেসর যেন সম্মোহিত করে ফেলেছেন ওদেরকে।

'ভয় লাগছে না তো, আর্কো? তা হলে হাতটা বাড়ান দেখি।'

'না, না!' চেঁচিয়ে উঠল গ্রেটা।

'বোকার মত চিল্লিও না, গ্রেটা! এতে ভয়ের কিছু নেই। দেখি, আর্কো–হাতটা!'

কোন কথা না বলে হাত বাড়িয়ে দিল আর্কো। প্রফেসর শার্টের আস্তিন গোটালেন। থোকা থোকা পেশিবহুল রোমশ হাত। সিরিঞ্জে আলো পরে ঝিকঝিক করছে–গ্রেটা মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। ফ্রাঞ্জ নিঃশ্বাস বন্ধ করল। সিরিঞ্জের পুরো ওষুধ পুশ করলেন প্রফেসর।

'বেশ,' শান্ত গলায়, শিশুকে প্রবোধ দেওয়ার মত বললেন তিনি। 'কাজ শেষ।'

তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা ফ্রাঞ্জকে আড়ষ্ট ভাব থেকে জাগিয়ে তুলল। বিড়বিড় করে প্রফেসরকে ধন্যবাদ দিল সে, গ্রেটার দিকে ফিরে নড় করল। তারপর চলে গেল।

সামনের দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে গ্রেটা ফিরল তার স্বামীর দিকে, 'তোমার কাছে সব সময়ই অ্যাসপিরিন থাকে–তুমি ওকে মরফিন দিলে কেন?'

স্ত্রীর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রফেসর, এক দৃষ্টিতে ফায়ার প্লেসের আগুন দেখছিলেন। ঝট্ করে ঘুরলেন তিনি, তাঁর চেহারায় হিমশীতল ভাব ফুটতে দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গেল গ্রেটা।

প্রফেসরের মুখ থেকে যেন সমস্ত রক্ত শুষে নেওয়া হয়েছে, নেকড়ের হাসি মুখে।

'মরফিন?' হিসহিস করে উঠলেন তিনি। 'আরে বোকা, তুমি ভেবেছ ওটা মরফিন? ভেবেছ আমাকে চিট করতে পারবে, আমাকে–পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীকে? এই আমি, যে বছরের পর বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে, দুরারোগ্য একটি অসুখের ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেই তার সাথে প্রতারণা করে তুমি পার পেয়ে যাবে ভেবেছ? আমার ল্যাবরেটরিতে ভয়ঙ্কর সব সেরাম রয়েছে। আমার সংগ্রহের সাথে কারও তুলনা চলে না। আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আর তার স্ত্রীর সাথে প্রেম করে যায় এক মাতাল? আর ব্যাপারটা তুমি উপভোগও করেছ, তাই না? আমি নিজে দেখেছি তোমাদের জড়াজড়ি করতে।'

উন্মাদের মত লাগছে প্রফেসরকে, ঝকঝক করে জ্বলছে চোখ, গলার স্বর ক্রমে চড়া হয়ে উঠল।

'আমি জানি আমি বুড়ো–তাই ওর সাথে পিরিত করতে গিয়েছ–আমার চেয়ে শক্তিশালী যুবকের সাথে। যার বাদামী চামড়ার মসৃণতা তোমাকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছ। ঠিক আছে, অপেক্ষা করো। নিজের চোখেই দেখতে পাবে ওই মসৃণ, বাদামী চামড়ার কী দশা হয়।'

বিরতি দিলেন প্রফেসর, হাঁপাচ্ছেন বেদম, গ্রেটা কী যেন বলতে গেল, এক ধাক্কা মেরে তাকে মেঝের উপর ফেলে দিলেন। তারপর আবার শুরু করলেন:

'দুইদিন আগে ভিয়েনার এক নোংরা বস্তিতে একটা জিনিসের মৃত্যু ঘটেছে। জানা গেছে ওটা আসলে মানুষ ছিল। কেউ জানে না কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে কী করে এতদিন ওটা বেঁচে ছিল। হয়তো বহু আগে ওটা সেলারে ঢুকেছে–মরার জন্য। সেলারের ইঁদুর খেয়ে জীবন ধারণ করেছে ওটা। একটা মাত্র হাত ছিল ওটার–পা ছিল না। ওটাকে যে দেখেছে সে-ই ভয়ে পালিয়েছে। আমি ওটাকে দেখতে গিয়েছিলাম। হাজার হাজার ইঁদুরের হাড়ের উপর চিৎ হয়ে পড়েছিল ও...

'মুখ বলতে কিছু নেই, যেখানে মুখ থাকার কথা সেখানে শুধু একজোড়া চোখ তাকিয়ে ছিল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে। ঠোঁটও নেই, গলা দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে আসছিল বীভৎস জিনিসটার। খাবার চাইছিল। কিন্তু ওই ভয়াল জীবটার কাছে যাবার সাহস পাচ্ছিল না কেউ, খাবার দেয়া দূরে থাক।'

ঘামে ভিজে গেছে প্রফেসরের মুখ, দম নেওয়ার জন্য থামলেন। তারপর যখন কথা বললেন, আশ্চর্য শান্ত শোনাল কণ্ঠ। 'গত ত্রিশ বছরে ভিয়েনায় ওটাই ছিল প্রথম কুষ্ঠ রোগী। আর দ্বিতীয় কুষ্ঠ রোগী হতে যাচ্ছে ফ্রাঞ্জ আর্কো।'

শাস্তি

ছোট্ট, ডিম্বাকৃতি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল টিনা ম্যাসন। দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট এক্সিকিউটিভ জেট এই মুহূর্তে পারস্য উপসাগর পাড়ি দিচ্ছে। নীচে ঝলমল করছে কাঁচের মত নীল জলরাশি। গন্তব্যের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। কিন্তু টিনা নিজের ভাগ্যকে যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাই বব-এর পাশের সীটে বসে আছে সে, একই যাত্রার শরিক; তবু ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠেকছে।

বব ব্রিটেনের খুবই নাম করা, বিশাল এক তেল কোম্পানির নির্বাহী অফিসার। সেদিন ঘরে ঢুকে ও যখন ঘোষণা করল হপ্তা খানেকের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছে বিজনেস ট্রিপে, বেশ ঈর্ষা বোধ করছিল টিনা।

'আমাকেও সাথে নিয়ে চলো না,' হালকা সুরে, ইয়ার্কির ছলেই কথাটা

বলেছিল সে। ওর টেকনিক কলেজের ফাইনাল পরীক্ষার আগে, দিন কয়েকের ছুটিতে বাড়ি এসেছে টিনা। সময় কাটছিল না কিছুতেই। কিন্তু অবাক হয়ে গেছে বব তার কথাটা অত্যন্ত সিরিয়াসভাবে নিয়েছে দেখে।

'বেশ তো চল না,' বলেছিল সে। 'আমিও তোকে নিয়ে যাব ভাবছিলাম। আমাকে ফার্স্টক্লাসে ভ্রমণের ভাড়া দিচ্ছে কোম্পানি। তুই যদি যেতে চাস তা হলে ট্যুরিস্ট ক্লাসের টিকেট কাটব। তোর ভাড়াটাও দিব্যি হয়ে যাবে। জুলিয়াসকে তোর কথা বলেওছি আমি। ও-ও খুব উৎসাহ দেখাল। তুই গেলে জুলিয়াসও ট্যুরিস্ট টিকেট কিনবে।'

সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেও ববের চোখে কৌতুকের প্রচ্ছন্ন ছায়া ঝিকমিক করছিল। সে আরও বলেছে, 'তবে সাবধান! বছরের এই সময়টাতে কিন্তু ও-দেশে সাংঘাতিক গরম পড়ে। চামড়া-টামড়া পুড়ে পেত্নী বনে যেতে পারিস। এখন ভেবে দেখ সত্যি যাবি কিনা।'

টিনা সত্যি যাবে কিনা? এটা কোন প্রশ্ন হলো! সে কিনা মধ্যপ্রাচ্য দেখার জন্য মুখিয়ে আছে। গুল্লি মারো গরমের।

'তুমি নিলে অবশ্যই যাব।' দ্বিতীয়বার চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করেনি টিনা। ভাইয়া তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে এই খুশিতে ধিনতা ধিনাক নাচ শুরু করে দিয়েছিল।

ববের চেয়ে দশ বছরের ছোট অষ্টাদশী টিনা। শরীরী সম্পদে পূর্ণ যুবতী হলেও বড় ভাইয়ের কাছে সে এখনও ছোট্টটিই রয়ে গেছে। বোনকে বব প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে। টিনার মনে পড়ে না তার কোন আবদার বব কোনদিন অগ্রাহ্য করেছে কিনা। তবে এতদূরে, ব্যবসার কাজে যেখানে যাচ্ছে ভাই, সেখানেও তাকে নিয়ে যাবে বোনটা একা ঘরে বসে মন খারাপ করবে ভেবে, এতটা আশা করেনি টিনা। তাই নিজের সৌভাগ্যের কথা ভেবে এতক্ষণ মশগুল ছিল সে। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরল সামনের সীটে বসা গ্রান্টের কণ্ঠ শুনে।

'আর আধঘণ্টার মধ্যে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাব।'

জুলিয়াস গ্রান্টের বয়স মধ্য-চল্লিশ, মাথায় ঘন চুল, ঠোঁটের উপর যেন পেন্সিল দিয়ে আঁকা সরু গোঁফ। ব্রিটিশ তেল কোম্পানিটির সে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ। আট বছর আগে, বব কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার পরে, তার দুর্দান্ত প্রতিভার পরিচয় পেয়ে সে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে, বলা যায়, গ্রান্টের হাতেই মানুষ হয়েছে বব। নিজে যা জানে, সব কিছু উজাড় করে তাকে শিখিয়েছে গ্রান্ট। বয়সের বিস্তর ফারাক সত্ত্বেও দু'জনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় লাগেনি। এখন তো ওদের দু'জনকে কোম্পানির অনেকেই আদর করে 'মানিকজোড়' ডাকে। জুলিয়াস গ্রান্ট টিনাকে ছোট বোনের মতই স্নেহের চোখে দেখে।

'শেখ তাঁর দেশে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যক্তিগত প্লেন পাঠাবেন এ আমি চিন্তাই করিনি.' আকাশে ওড়ার পরে এ নিয়ে চারবার কথাটা বলল টিনা। এয়ারক্রাফটের

ভেতরের বিলাসবহুল সৌন্দর্যে সে রীতিমত মুগ্ধ। 'একেই বলে লাক্সারী।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল গ্রান্ট। 'তেলের মূল্য হ্রাস নিয়ে কথা-বার্তার রেজাল্ট কী হবে জানি না। তবে মনে হয় লোকটা আমাদেরকে জামাই-আদরেই রাখবে।'

'আমি ভাবছি অন্য কথা।' পত্রিকার পাতা থেকে মুখ তুলে চাইল বব। 'শুনেছি কাহরাইনের এই শেখ, শেখ আবদুল আল হারিদ নাকি সাংঘাতিক নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। নিজের দেশে স্বৈরাচার বলে তার একটা কুখ্যাতি আছে।'

'খবরের কাগজ পড়ে তথ্যটা জোগাড় করেছ, না ভাইয়া?' টিনা মৃদু খোঁচা দিল ববের পাঁজরে।

'খবরের কাগজে বিস্তারিত কিছু লেখেনি,' চিন্তিত দেখাচ্ছে ববকে। 'তবে যেটুকু পড়েছি তাতে মনে হচ্ছে দেশটাতে গণতন্ত্রের চর্চা বলে কিছু নেই। ওয়ান ম্যান শো চলছে ওখানে। প্রচণ্ড শক্তিশালী এই শেখের নিজের ছোটখাট একটা সেনাবাহিনী আছে। দেশের জনগণের বাঁচা-মরা নাকি তাঁর ওপর নির্ভর করে। সে কাউকে তোয়াক্কা করে না।'

'এটা নতুন কিছু নয়, বব,' ব্যাখ্যা করল গ্রান্ট। 'আমি মধ্য প্রাচ্যের অন্তত হাফ ডজন দেশের নাম বলতে পারি যেখানে স্বৈর শাসন চলছে।'

'জানি আমি। তবে কাহরাইনে নাকি সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর উপায়ে দমন করা হয়,' বলল বব। 'দু'একটা পত্রিকা লিখেছে শেখ এবং তাঁর লোকদের বর্বর বললেও নাকি কম বলা হয়।'

'আসলে এটা নির্ভর করে কে, কীভাবে কোন্ দৃষ্টি ভঙ্গিতে ব্যাপারটা দেখছে তার ওপর,' বলল গ্রান্ট। 'বড় বড় দেশগুলো কী করছে? রাশিয়া হাঙ্গেরী এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় কি ঘটনা ঘটাচ্ছে? চীনারা তিব্বতে? আমেরিকানরা ভিয়েতনামে কি করেছিল বা ফরাসীরা আলজিয়ার্সে? ব্রিটিশরাও তো সাইপ্রাসে কম অত্যাচার করেনি। এদের তুলনায় খুদে একটা আরব রাষ্ট্র কতটুকুই বা নির্মম হয়ে উঠতে পারে? কই, পত্রিকাঅলারা তো এসব বড় দেশের কু-কীর্তির কথা বিস্তারিত লেখে না? কাজেই, স্রেফ কতগুলো পত্রিকা কাটিং-এর ওপর নির্ভর করে হারিদকে আগেই দোষারোপ করে বসো না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ, জুলিয়াস,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর সাথে একমত হলো বব। 'তবে যে লোক নিজে দেশ চালায়, তার দেশেই বেশি সংঘাত আর হত্যার কথা শুনলে আমার শরীরটা রাগে রি রি করে ওঠে। এ তো স্রেফ সামন্ততন্ত্র আর মধ্যযুগীয় কাজ-কারবার।'

'যদি তাই হয়ে থাকে,' ধৈর্য ধরে ওকে বোঝাচ্ছে গ্রান্ট, 'তা হলে তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথার কী দরকার? ওটা কাহরাইন সরকারের ব্যাপার। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কত কম খরচে তেল চুক্তি নবায়ন করা যায় তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা।'

'আর আমাদের একথাও মনে রাখা উচিত ভদ্রলোক কত বিরাট মনের অধিকারী হলে নিজের প্লেন পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাদেরকে নিয়ে যাবার

জন্যে,' এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলল টিনা।

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল গ্রান্ট। 'আর যাত্রাটা যদি তোমাকে করতে হত এয়ারকন্ডিশন এবং প্রেশারাইজেশন ছাড়া কোন লঝ্ঝরে ডাকোটায়, তা হলে তুমি ভদ্রলোকের প্রশংসায় আরও পঞ্চমুখ হয়ে উঠতে।'

'বাজি ধরতে পারি ডাকোটায় এ ধরনের জিনিসও নেই,' মৃদু হাসল বব। ইঙ্গিত করল বাদামী রঙের আকর্ষণীয়া এয়ারহোস্টেসের দিকে। সুন্দরী বিমানবালাটি যাত্রার শুরু থেকে তাদের ফল-মূল, ড্রিঙ্কস ইত্যাদি অফার করে আসছে। তার সেবা-যত্নে, আচরণে আন্তরিকতার ঘাটতি নেই। এই মুহূর্তে তাকে দেখা যাচ্ছে প্লেনের সামনের অংশে, ঝকঝকে সাদা দাঁতে মধুর হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে আসছে এদিকেই। তেহরানে, শেখের ব্যক্তিগত প্লেনে ওঠার পর থেকে তরুণীর মুখের হাসি এক সেকেন্ডের জন্যও ম্লান হতে দেখেনি বব ম্যাসন।

'আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে কাহরাইনে ল্যান্ড করতে যাচ্ছি,' সুরেলা গলায় ঘোষণা করল সুন্দরী। 'অনুগ্রহ করে যে যাঁর সীট বেল্ট বেঁধে ফেলুন।'

কাহরাইন পারস্য উপসাগরের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। ছোট্ট এই শেখ রাজ্যটির সীমান্তের মাইল বিশেক ভূমি ঢুকে গেছে সৌদি আরবের বিশাল সীমারেখার মধ্যে, আর দশ মাইলের মত রাস্তা চলে গেছে উপকূল বরাবর। দুশো বর্গমাইল আয়তন হলেও কাহরাইন বিশ্বের সেরা ধনী দেশগুলোর একটি। সূর্য তাপে ঝলসানো এ দেশের বালুর নীচে রয়েছে তেলের অফুরন্ত ভাণ্ডার। একমাত্র, ছোট্ট এয়ারপোর্টটি রাজধানীর পশ্চিমে, ওটার নামও কাহরাইন। মোট জনগোষ্ঠীর আশিভাগের বাস রাজধানীতে।

ওদের তিনজনকে এয়ারপোর্ট থেকে তুলে নিল কালো এক মার্সিডিজের ড্রাইভার, সোজা চলল শেখের রাজপ্রাসাদের দিকে। পথে একটা কথাও বলল না ড্রাইভার। আধঘণ্টার মত গাড়ি চালিয়ে লোকটা ঢুকে পড়ল সশস্ত্র গার্ডদের প্রহরাধীন প্রশস্ত গেট দিয়ে, এগোল পাহাড় চুড়োয় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল, সাদা এক দালানের দিকে। দেখতে দেখতে নগরীর তিন দিকের ধূলি ধূসরিত রাস্তা এবং পারস্য উপসাগরের জলরাশির নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। গাড়ি এসে থামল চওড়া পোর্টিকোর সামনে। ওখানে সাদা আলখেল্লায় শরীর ঢেকে, আরবদের প্রথাগত পাগড়ি মাথায় দিয়ে এক দীর্ঘদেহী লোক অপেক্ষা করছিল। সে ববদের দেখে এগিয়ে এসে কুর্নিশ করল।

'আমি হাসান,' নিজের পরিচয় দিল লোকটি গম্ভীর গলায়। 'শেখ আবদুল আল হারিদের একান্ত সচিব। কাহরাইনে সুস্বাগতম।' পুরুষ দু'জনের সাথে সে হাত মেলাল, তার দাড়িঅলা মুখে হাসির চিহ্নমাত্র ফুটল না। তারপর টিনার দিকে ঘুরে বলল, 'এই সুন্দরীটি কে?'

'আমার বোন টিনা,' জবাব দিল বব।

'আপনাকেও স্বাগতম, মিস টিনা।' হাসান টিনার একটা হাত ধরল, কুর্নিশ করার আগে গভীর, সম্মোহিত দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ওর দিকে।

'ধন্যবাদ,' লাজুক হাসি ফুটল টিনার ঠোঁটে। 'আমি আসলে স্রেফ ঘুরতে এসেছি। বব এবং মি. গ্রান্ট যখন তাঁদের কাজে ব্যস্ত থাকবেন ওই সময়টাতে আপনাদের দেশটা একটু ঘুরে দেখতে চাই।'

'সেক্ষেত্রে, আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, আপনার ভ্রমণটা উপভোগ্য হয়ে উঠবে।' হাসান এবার ওদের তিনজনকে উদ্দেশ্য করেই বলল, 'কাহরাইনে যে ক'দিন আছেন, মহামান্য শেখ সে ক'টা দিন তাঁর প্রাসাদে আপনাদের আতিথ্য কামনা করেছেন।'

'কিন্তু আমি তো স্রেফ ছুটি কাটাতে এসেছি,' বলে উঠল টিনা। 'আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না…'

'তাঁর আতিথ্য গ্রহণ না করলে শেখ খুব মনঃক্ষুণ্ন হবেন।' ওর কথা শেষ করতে দিল না হাসান। তারপর গোটা ব্যাপারটার যেন নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, এমনভাবে বলল, 'তা হলে আপনারা আসুন আমার সাথে। আপনাদের ঘর দেখিয়ে দেই। লাগেজের জন্যে চিন্তা করতে হবে না। ওগুলো জায়গামত পৌঁছে যাবে।'

রাজপ্রাসাদের ভিতরটা আশ্চর্য ঠাণ্ডা। ক্যাথেড্রালের কথা মনে করিয়ে দিল টিনাকে। পালিশ করা মার্বেল পাথরের ঝকঝকে মেঝেতে ওদের জুতোর শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল। ওরা একটা করিডর ধরে এগোচ্ছে, দু'পাশে অসংখ্য বড় বড় খালি ঘর। মাথার উপর ছাদটা মোজাইক করা, অত্যন্ত দামী ঝাড়বাতি ঝুলছে, দেয়াল জোড়া সুদৃশ্য সব পেইন্টিং প্রাসাদের ভিতরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে বহু গুণ।

টিনাদের ঘরগুলো দারুণ সব বিলাস বহুল সরঞ্জাম দিয়ে সাজানো, পাঁচ তারা হোটেলের চেয়েও সুন্দর। হাসান চলে যাবার পরে বব মন্তব্য না করে পারল না, 'গেস্টরুমই যদি এত সুন্দর হয়, শেখের ঘর না জানি আরও কত সুন্দর!'

'ভাল কথা,' বলে উঠল টিনা, 'আমি কী পরে শেখের সাথে দেখা করতে যাব?'

'যা খুশি পরতে পারো,' ওকে পরামর্শ দিল গ্রান্ট। 'তোমার মত সুন্দরী মেয়েকে যে কোন ড্রেসে দেখলেই শেখ খুশি হবে।'

'যাই বলো, ভাইয়া। আমার ক্লাসের মেয়েগুলোকে এই ঘটনাটা বললে ওরা স্রেফ হাঁ হয়ে যাবে।' খুশিতে ঝলমল করছে টিনা।

'এত লাফালাফি করিস না,' বলল বব। 'শেখদের হারেমে অনেক সুন্দরী মেয়ে থাকে। তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় তুই পারবি না।'

'তুমি যে কী! আমার বয়েই গেছে প্রতিযোগিতা করতে।' ঠোঁট ওল্টাল টিনা।

'তোমার কথা যদি সত্যি হয়,' ববের দিকে তাকিয়ে হাসল গ্রান্ট, 'তা হলে শেখ হয়তো তার হারেম সুন্দরীদের দু'একজনকে আমাদের দেখার সুযোগ করেও

দিতে পারে।'

'তোমাদের পুরুষদের এই একটা দোষ,' কপট রাগে চোখ রাঙাল টিনা। 'এসেছ কাজ নিয়ে। এখন তা বাদ দিয়ে হারেম-সুন্দরীদের নিয়ে পড়েছ। ভুলে যেয়ো না, একমাত্র আমিই এসেছি হাতে কোন কাজ না নিয়ে। শুধুই ঘুরে বেড়াব।'

শেখ আবদুল আল হারিদ বেঁটেখাট মানুষ, গালে ঘন চাপ দাড়ি, চোখ জোড়া কুঁৎকুতে। টিনার সাথে শেখের পরিচয় হবার সময় সে লোকটার স্থির দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করছিল, কী করবে বা বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। শেখ যখন তার নরম হাত ধরে ঠোঁটে ছোঁয়াল, সে প্রত্যুত্তরে শুধু মৃদু মাথা ঝাঁকাল।

'আপনার আকস্মিক আগমনে আমি সত্যি আনন্দিত হয়েছি, মিস ম্যাসন।' হাসানের মতই গম্ভীর গলা তার। শেখ ববের দিকে ফিরল। 'আপনার বোন খুবই সুন্দরী, মি. ম্যাসন।' এক চিলতে হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'আমি এখানকার অনেক উপজাতি সর্দারকে চিনি যারা ওঁর বদলে প্রচুর ছাগল ভেট দিতে দ্বিধা করবে না। যদিও জানি এই ভদ্রমহিলা বিক্রির জন্যে নন।'

'টিনার বদলে যদি প্লেন ভর্তি করে ছাগল নিয়ে যাই তা হলে বাবা-মা আমার হাড়গোড় আর আস্ত রাখবেন না।' দাঁত বের করে হাসল বব।

তবে হারিদের চেহারা সিরিয়াস দেখাল। 'হ্যাঁ, আমি জানি, আধুনিক যোগাযোগের এই যুগেও পুব আর পশ্চিমের মধ্যে সংস্কৃতির ফারাক অনেক। দুই প্রান্তের মানুষেরা পরস্পরের সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানে না। কাহরাইনে আমরা বিংশ শতাব্দীর সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করলেও আমাদের পুরানো প্রথা এবং রীতিগুলোকে ভুলে যাইনি। সে এক এক করে ওদের তিনজনকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখল। তারপর বলল, 'আল্লাহর পরেই আমাদের কাছে সবচে' গর্বিত আমানত হলো আমন্ত্রিত মেহমান। এখানে কয়েকটা দিন থাকুন। নিজেরাই আমার কথার প্রমাণ পাবেন।'

'আপনার মহানুভবতা এবং আতিথেয়তার প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি, সার,' বিনয়ের অবতার সাজল গ্রান্ট।

'বেশ, বেশ,' খুশি হলো শেখ। 'এখন খানিকক্ষণের জন্যে আমাকে ক্ষমা করতে হবে। কাল সকালে, আমাদের আলাপ-আলোচনা শুরু হবার আগে, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদেরকে আমার প্রাসাদের কিছু চিত্তাকর্ষক জিনিস দেখাব।'

সে ক্ষমা প্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকাল টিনার দিকে। 'কিছু মনে করবেন না, মিস টিনা, যে সব জায়গায় আমরা যাব সেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে পারব না। কারণ প্রথাগত ভাবে ওই জায়গাগুলোতে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ।'

হাসল সে। 'বুঝতেই পারছেন, আপনাদের দেশের মত আমাদের মেয়েরা অতটা স্বাধীন নয়। সে স্বাধীনতা কখনও পাবে বলেও মনে হয় না। তবে আগামী

পরশু আপনাদের সম্মানে আমি ডিনার পার্টির আয়োজন করেছি। ওখানে যদি আপনি পদধূলি দেন, নিজেকে সম্মানিত বোধ করব। আমি অবশ্য আপনার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমাদের ছোট্ট দেশটার যেখানে যেতে চান, ড্রাইভারকে বললেই সে নিয়ে যাবে। তা হলে এবার আসি।'

পরদিন সকালে, টিনা গাড়ি চড়ে রাজধানী দেখতে বের হলো। আর শেখ হারিদের সঙ্গী হলো বব এবং গ্রান্ট। হারিদ নিজেই ওদেরকে প্রাসাদ ঘুরিয়ে দেখাবে বলেছে। দলটার পেছনে, হাসান এবং সশস্ত্র গার্ডরা সতর্ক দূরত্ব রেখে ছায়ার মত লেগে থাকল।

প্রাসাদটি শিল্পকলা এবং অ্যান্টিকসের অমূল্য এক ভাণ্ডার যেন। শেখের রুচির তারিফ করতে হয়। প্রতিটি অ্যান্টিক এবং চিত্রকলার ইতিহাস হারিদের কণ্ঠস্থ। প্রায় এক ঘণ্টা প্রাসাদ ভ্রমণের পরে, গোপন এক লিফটে চড়ে শেখ ওদেরকে নিয়ে এল বিশাল এক গোলাকার গম্বুজের কাছে। গম্বুজটা প্রাসাদের মাথায়, ঝুল-বারান্দায় দাঁড়ালে গোটা কাহরাইন শহর ভেসে ওঠে চোখের সামনে। এত উঁচুতে বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা, ওদের ঘামে ভেজা মুখে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল। বব আর গ্রান্টের মনে হলো ওরা যেন রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

'আপনাদের এখানে নিয়ে এসেছি এমন এক জিনিস দেখাতে যা পাশ্চাত্যের খুব কম মানুষেরই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে,' গমগমে গলায় বলল শেখ হারিদ।

তারা লিফটে চড়ে আবার নেমে এল নীচে, প্রাসাদকে পেছনে ফেলে, চলে এল বিরাট এক মাঠে। প্রাসাদের কাছে এই অংশটা ঝোপঝাড়ে ঢাকা, উঁচু দেয়াল দিয়ে ভাগ করা। দেয়ালের পেছনে বড় লোহার গেট, সশস্ত্র গার্ডদের সংখ্যা এখানে প্রাসাদের চেয়েও বেশি। ভিতরে ঢোকার এটাই একমাত্র রাস্তা। শেখকে দেখে দারোয়ান সসম্ভ্রমে গেট খুলে দিল, ভিতরে ঢুকতেই অসাধারণ সুন্দর একটি বাগানের ল্যান্ডস্কেপ বিদেশী অতিথিদের চোখ জুড়িয়ে দিল।

'ভদ্রমহোদয়গণ, এটা হলো আমার পোষ্যদের বাগান,' ঘোষণার সুরে বলল শেখ। ভিতরে ঢোকার পরপরই পেছনের গেট বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

এদিকে সামনের দৃশ্যটা দেখে বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেছে দুই ব্রিটিশ নাগরিকের। না, ওরা বাগানের অজস্র নাম না জানা ফুলের অসাধারণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়নি বা মোজাইক করা সুইমিং পুলের স্ফটিক স্বচ্ছ জলধারায় অবিরাম ঝর্ণার পানি পড়ার দৃশ্য দেখেও মনে বিস্ময় জাগেনি। ওদের ঘোর লাগার কারণ এটাও নয় যে অসংখ্য অ্যাকাশিয়া গাছ এবং সাদা ছালঅলা চিনার ট্রী, যেগুলো বাগানটাকে সূর্যের খরতাপ থেকে রক্ষা করছে এবং জায়গাটিকে করে তুলেছে সবুজ, ছায়াময় এক মরুদ্যান।

আসলে ওদের বিহ্বল মুগ্ধতার কারণ সুইমিং পুলের ভিতর সাঁতার কাটতে ব্যস্ত এবং পুলের ধারে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা জনা বিশেক চোখ ধাঁধানো সুন্দরী। এদের কারুরই বয়স আঠারোর ওপরে নয়। আর সবচে' অবাক ব্যাপার হলো,

শ্বাসরুদ্ধকর সুন্দরী তরুণীদের কারও গায়ে এক চিলতে সূতাও নেই। সবাই নগ্ন!

'চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি আপনারা টাশকি খেয়ে গেছেন,' ঠাট্টা করল শেখ। 'চলুন, সামনে এগোই।'

ওরা বাগানে ঢুকতে সবগুলো মেয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেল। যারা পানিতে ছিল তারাও সাঁতার বন্ধ করে দিল। বব এবং গ্রান্টের মনে হলো তারা স্বর্গে ঢুকেছে এবং স্বর্গের অপ্সরীরা ওদেরকে গার্ড অভ অনার দিচ্ছে। প্রতিটি নগ্ন শরীর ওরা দেখল প্রশংসা মেশানো কামনার দৃষ্টিতে।

'ব্যাপারটা অদ্ভুতই বলতে হবে।' বাগানের মাঝখানে এসে থেমে দাঁড়াল শেখ। সবজান্তার হাসি ফুটে আছে মুখে। 'কারণ আমি এ পর্যন্ত যত অতিথিকে এখানে নিয়ে এসেছি, সবাই বাগানে ঢুকে নির্বাক হয়ে গেছেন। যেন বোবা, কথাই বলতে পারেন না।'

অনেক কষ্টে মুখে বোল ফুটল ববের। 'রূপ এবং সৌন্দর্যের এত বিপুল সমারোহ এর আগে কখনও দেখিনি, সার। তাই অবাক হয়ে ভাবছিলাম এটাই গল্পে শোনা সেই হারেম কিনা।'

উদাস ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল শেখ। 'অনুগ্রহ করে ভুল ধারণা করে বসবেন না। এটা আমার হারেম নয়। ওটার অবস্থান প্রাসাদের আরেক অংশে। সেখানে আমি নিজে এবং আমার বিশেষ প্রহরীরা ছাড়া অন্যদের কঠোরভাবে প্রবেশ নিষেধ। আর আমার হারেমের মেয়েরা এদের মত ন্যাংটো হয়েও থাকে না। নো, জেন্টলমেন, এরা আমার বন্দিনী।'

'বন্দিনী?' একই সাথে বিস্ময়ের সুরে প্রশ্নটা করল ওরা দু'জনে।

'জ্বী। এদের এখানে ধরে আনা হয়েছে আমার এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু বেআইনী কাজ করার অপরাধে।' হারিদ তার হাত দুটো শরীরের দু'পাশে মেলে দিল। 'কিন্তু আমি ওদের বিচার কীভাবে করি? যদিও আমি ওদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, কিন্তু মানুষ তো। তাই আল্লাহর হাতে ওদের নিয়তিকে ছেড়ে দিয়েছি। সর্বশক্তিমান যখন সিদ্ধান্ত নেবেন, তার আগের সময়টুকু, আমি ওদের বন্দিত্বের যন্ত্রণা থেকে যতটা পারি মুক্তি দেয়ার চেষ্টা করি, চেষ্টা করি সময়টা ওদের জন্যে উপভোগ্য করে তোলার।'

শেখ ওদের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল।

'যাবার আগে একটা কাজ আছে। আপনাদের সুযোগ দেয়া হলো এই মেয়েদের মাঝ থেকে যে দু'টিকে পছন্দ হয়, আজ রাতের জন্যে তাদেরকে শয্যাসঙ্গিনী করতে পারবেন।'

'ওদের মধ্যে যাকে খুশি বেছে নিতে পারব?' জিজ্ঞেস করল বব। ভুল শুনেছে কিনা সন্দেহ হলো ওর।

'হ্যাঁ, যাকে খুশি,' ওকে আশ্বস্ত করল শেখ। 'আর সে সুযোগটি আপনাকেই আগে দিচ্ছি, মি. ম্যাসন।'

প্রতিটি মেয়েই অপূর্ব সুন্দরী, যে কোন পুরুষের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারে। সে

নগ্ন থাক আর পোশাক পরাই থাক। বব অবশ্য ঘুরে ফিরে দেখল ওদেরকে। শেষে লম্বা, কফি রং ত্বকের একটি মেয়েকে পছন্দ করল। বাগানে ঢোকার সময় ওর দিকেই প্রথম চোখ আটকে গিয়েছিল ববের। সাঁতার কাটছিল মেয়েটি। ওদেরকে দেখে ঝটপট উঠে দাঁড়িয়েছিল পুল থেকে। তার সুঠাম, নগ্ন শরীর থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছিল পানি। এই মেয়েটির বয়স সতেরোর বেশি হবে না কিছুতেই। তবে এই বয়সেই শরীরী সম্পদে ভরপুর হয়ে উঠেছে।

'এখানকার সবগুলো মেয়েই সুন্দরী, তবে আমার সবচে' পছন্দ হয়েছে পুলের পাশে দাঁড়ানো ওই মেয়েটিকে, সার,' কোনরকম দ্বিধা না করে বলল বব।

শেখ মেয়েটির কাছে নিয়ে এল ববকে, হাত দুটো কোমরের পাশে রেখে সটান দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। তার নিখুঁত দেহসৌষ্ঠব যেন মেহগনি কাঠ দিয়ে খোদাই করা। হাসান কী একটা ইঙ্গিত করতে পাথরের মূর্তি প্রাণ ফিরে পেল, হেঁটে এল ববের দিকে। তার শরীরে নদীর ঢেউ উঠল, নিতম্বের দুলুনি দেখে বুক শুকিয়ে এল ববের, প্রতিটি পদক্ষেপে ঝাঁকি খেল আশ্চর্য সুন্দর দুই বুক। ববের মনে হলো মেয়েটা তাকে প্রলুব্ধ করার জন্য ইচ্ছে করে শরীর নাচাচ্ছে।

'আপনার পছন্দের তারিফ করতে হয়, মি. ম্যাসন,' প্রশংসার সুরে অবশেষে বলল শেখ। তার হাত ছুঁয়ে গেল মেয়েটির পেলব ত্বক। 'এ মেয়েটা সত্যি সুন্দর। আজ রাতটা ও আপনার জন্যে বুক্ড্ হয়ে গেল। তবে একটা কথা–ওর শরীরের কোন অঙ্গটা আপনার নজর কেড়েছে সবচে' বেশি?'

'ওর সব কিছুই সুন্দর,' বলল বব।

'কিন্তু আলাদাভাবে কিছু না কিছু ভাল তো লেগেছে, নাকি?' নাছোড়বান্দার মত জানতে চাইল শেখ।

'তা অবশ্য লেগেছে। আমার বলতে দ্বিধা নেই ওর মত চমৎকার, সুঠাম পা আমি আর কোন মেয়ের দেখিনি,' জবাব দিল বব।

'বেশ, বেশ।' শেখ হাততালি দিয়ে উঠল, ফিরল জুলিয়াস গ্রান্টের দিকে। 'তা, মি. গ্রান্ট, অনুগ্রহ করে বলবেন কি আজ রাতের শয্যা সঙ্গিনী হিসেবে কোন্ মেয়েটিকে আপনার পছন্দ?'

সফল রাজধানী ভ্রমণ সেরে খুশিতে বাগ বাগ টিনা তার অভিজ্ঞতার কথা অপর দু'জন সঙ্গীর কাছে বয়ান করে যাচ্ছিল, হঠাৎ হতাশ হয়ে লক্ষ করল বব এবং গ্রান্ট কেউই তার কথা শুনছে না, নিজেদের মধ্যে কী সব গুজুর গুজুর শুরু করে দিয়েছে।

'ভাইয়া, তোমরা দেখছি আমার কথা মোটেই শুনছ না!' ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে শেষে অভিযোগ করে বসল টিনা। 'কোথায় ভাবলাম আমার সারা দিনের অভিজ্ঞতার কথা আগ্রহ নিয়ে শুনবে, তা না, তখন থেকে দু'জনে কী গোপন শলা-পরামর্শ করে চলেছ। ব্যাপারটা কি শুনি?'

'সরি, টিনা,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল বব। অর্থবোধক দৃষ্টিতে তাকাল

গ্রান্টের দিকে। 'রাগ করিস না, বোন। আজ সারাদিন শেখের সাথে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন খুব ঘুম পাচ্ছে। উঠব আমি।'

'আমিও,' দ্রুত বলল গ্রান্ট। 'নরম বিছানা আমাকেও খুব টানছে।'

'তোমাদের দু'জনের কী হয়েছে বলো তো?' মুখ ঝামটা দিল টিনা। 'মাত্র সন্ধ্যা গড়িয়েছে। কোথায় ভেবেছি কাহরাইনের রাতের জীবন দেখাতে তোমরা আমাকে নিয়ে বেরুবে, এখন দুজনেই দেখছি বাচ্চাদের মত হাই তুলতে শুরু করেছ।'

'আজ রাতটা থাক, লক্ষ্মী বোন আমার,' মিনতি করল বব। 'আসলে সারাদিন রোদে ঘুরে মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে। একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়।'

সে আদর করে বোনের গালে চুমু খেলো, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কেউ একজন ওকে অনুসরণ করছে, স্পষ্ট টের পেল বব। তার ঠোঁটে ফুটে উঠল রহস্যময় হাসি।

খানিক পরে গ্রান্টও উঠে দাঁড়াল। টিনাকে সঙ্গ দিতে পারল না, সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করে হাঁটা দিল নিজের ঘরের উদ্দেশে।

'আশ্চর্য লোক তো!' অসন্তোষ নিয়ে বিড়বিড় করল টিনা। 'চুটিয়ে আড্ডা দেব ভেবেছিলাম অথচ তেনারা ঘুমিয়েই কাদা। যত্তসব!'

বব নিজের ঘরে ঢোকার কয়েক মিনিট পরে মেয়েটি এল। সে শুয়ে শুয়ে সকালের ঘটনাটির কথা ভাবছিল। মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখেছে। সেই মেয়েকে এবার সত্যি সত্যি সামনে দেখেও নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হলো না ববের।

সুইমিং পুলের সেই মেয়েটি এখন আর নগ্ন নয়। নীল সিল্কের খাটো গাউন পরে আছে সে। পোশাকটিতে দারুণ মানিয়ে গেছে তাকে, সকালের চেয়ে হাজার গুণ বেশি মোহময়ী লাগছে। বব কিছু বলার আগেই মেয়েটি গলার কাছের বোতামটা খুলে ফেলল, আলগোছে শরীর থেকে খসে পড়ল গাউন, গোড়ালির কাছে স্তূপ হয়ে রইল। নীচে কিছু নেই তার, প্রথম দেখার সেই দৃশ্যের মত আদুল গা।

'আমাকে বলা হয়েছে আপনাকে আনন্দ দিতে,' জড়তাহীন গলায়, ভাঙা ইংরেজিতে কথাটা উচ্চারণ করল মেয়েটি।

বব টের পেল তার শিরাগুলোতে রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে উঠেছে।

'তোমার মত সুন্দরী জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি।' হাত বাড়িয়ে ওকে বিছানার পাশে বসাল বব। মেয়েটির কোমল একটা হাত তুলে নিল নিজের মুঠিতে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল খোলা শরীরের দিকে। 'তোমার দিকে চেয়ে থেকেই আমি যথেষ্ট আনন্দ পাচ্ছি।'

মেয়েটি আস্তে ববের মুঠো থেকে হাতটা টেনে নিল, সেঁধিয়ে গেল ওর উষ্ণ আলিঙ্গনের ভিতরে। মৃণাল দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে, মাথাটা চেপে ধরে টেনে আনল নিজের মুখের কাছে, দু'জোড়া ঠোঁট একত্রিত হলো।

মেয়েটিকে বাধ্য করা হয়েছে ওর ভোগের উপকরণ হতে, এটা ভেবে খানিক আগেও সামান্য অপরাধ বোধে ভুগলেও এই মুহূর্তে বব তা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। মেয়েটির রেশম কোমল শরীরের উত্তেজক স্পর্শ তার মন থেকে যাবতীয় জাগতিক চিন্তা-ভাবনাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, শুধু পার্থিব হয়ে রইল সঙ্গিনীর শারীরিক উপস্থিতি।

উন্মাদের মত প্রেম করল ওরা, শুধু কামনা নয়, তরুণীর প্রতি একটা পর্যায়ে বুকের গভীর থেকে ভালবাসা উৎসারিত হলো ববের। ফলে ওদের মিলন পর্বটা হলো দীর্ঘস্থায়ী এবং তৃপ্তিদায়ক। মেয়েটি শুধু সুন্দরীই নয়, বয়স কম হলেও, শরীরী খেলার কলা-কৌশলগুলো দারুণ রপ্ত করা আছে তার। পুলকের সাগরে ভাসতে ভাসতে ববকে মনে মনে স্বীকার করতেই হলো এত সুখ সে জীবনে পায়নি।

প্রেম করার পরে মেয়েটি শুয়ে থাকল ববের প্রশস্ত বুকের উপর। টুকটাক কথা বলছে ওরা। বব জানল তরুণীর নাম তাহমিনা, কাহরাইনে বড় হয়েছে সে, ইংরেজি শিখেছে বাপের কাছ থেকে।

'তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে, তাহমিনা,' কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল বব। 'আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।'

কথাটা শোনার সাথে সাথে মেয়েটির শরীর পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল। শারীরিক পরিবর্তনটুকু টের পেয়ে অবাক হয়ে ওর চোখের দিকে তাকাল বব। দেখল গভীর, কালো দুই চোখে ভয় আর বেদনা ফুটে উঠেছে।

'কী হলো?' জানতে চাইল বব।

'ও কথা আমাকে বলবেন না, সার,' বলল তাহমিনা।

'সার নয়। আমাকে ববি ডাকতে পারো।' ওর থুতনি ধরে আদর করল বব। 'কথাটা কেন বলব না বলো তো? তোমাকে প্রথম দেখায় আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম তা কি বুঝতে পারোনি?'

'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি শেখ হারিদের কয়েদী। আজ রাতের পরে আপনার সঙ্গে হয়তো আমার আর কোনদিন দেখাও হবে না,' বিমর্ষ হয়ে বলল তাহমিনা।

'কেন, দেখা হবে না কেন? তুমি ওর কী ক্ষতি করেছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল তাহমিনা। 'আমি কিছু করিনি। তবে আমার বাবা, কাহরাইনের এক সংবাদপত্রের মালিক, তিনি শেখের সমালোচনা করে একটা সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। শেখ সেটাকে ব্যক্তিগত অপমান বলে ধরে নিয়েছে।'

'তাতে তোমার দোষটা কোথায়?'

'আপনি শেখকে চেনেন না। খুবই নিষ্ঠুর স্বভাবের মানুষ সে। তার আঁতে ঘা লাগলে প্রতিশোধ নেবেই। আর তার প্রতিশোধের ধরনটাও অদ্ভুত। আমার বাবা বুড়ো মানুষ, খুবই অসুস্থ। যে-কোন সময় মারা যেতে পারেন। তাই শেখ তাঁকে মারবে না। ধরে এনেছে আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে। যাতে আমার বাবা মানসিক

কষ্টে শেষ হয়ে যান। যে-সব মেয়েকে আপনি বাগানে দেখেছেন, ওদের বেশিরভাগই নিরপরাধ। কিন্তু ওদের প্রাসাদে ধরে আনা হয়েছে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে। ওই মেয়েদের বাপ-চাচারা হয়তো অপরাধ করেছে কিন্তু ধরে আনা হয়েছে ওদেরকে।'

'তোমাকে কি শাস্তি দেবে শেখ?' জিজ্ঞেস করল বব।

'জানি না,' বলল তাহমিনা। 'কেউই জানে না কার ভাগ্যে কী শাস্তি অপেক্ষা করছে। তবে শুনেছি ভয়ঙ্কর সব শাস্তির শিকার হতে হয় অসহায় মেয়েগুলোকে। এখানে যে মেয়েদের ধরে আনা হয়, তাদের কাউকেই একবছরের বেশি প্রাসাদে রাখা হয় না। আর শুনেছি, শেখের অতিথিদের সঙ্গে কেউ রাত কাটালে পরদিন থেকে তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।'

'কিন্তু আমি তোমার সন্ধান পাব,' থমথমে গলায় বলল বব। 'তোমাকে আমি খুঁজে বের করবই। ভয় পেয়ো না, তাহমিনা। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে কথা দিলাম।'

সে রাতে ওরা আরও কয়েকবার সুখের সাগরে সাঁতার কাটল। তারপর তাহমিনার বুকে মাথা রেখে, ওর সুগন্ধী শরীরের ঘ্রাণ নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়ল ক্লান্ত বব।

পরদিন ঘুম ভেঙে দেখল তাহমিনা নেই। চলে গেছে।

•

'তোমাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কাল সারারাত দু'জনেই জেগেছিলে,' নাস্তার টেবিলে হালকা সুরে কথাটা বলল টিনা বব এবং গ্রান্টকে।

ওরা দু'জন দৃষ্টি বিনিময় করল শুধু, কোন মন্তব্য করল না। নাস্তা খেয়ে টিনা চলে যাবার পরে মুখ খুলল।

'তোমার মাথা এখনও ভোঁ ভোঁ করছে নাকি?' ঠাট্টা করল গ্রান্ট। 'তবে আশা করছি রাতটা মন্দ কাটাওনি।'

'দারুণ!' জবাব দিল বব। 'তোমার সময় কেমন কেটেছে?'

'তোমার মতই,' হাসল গ্রান্ট। 'চলো, ওঠা যাক। আমাদের কাহরাইনিয়ান বন্ধুটির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের আলাপ সারতে হবে।'

আলোচনা পর্ব হলো দীর্ঘ, শেষ হলো কোন উপসংহার না টেনেই। কাহরাইনিয়ানরা শুরুতেই নানা তাল-বাহানা দেখাতে লাগল, ছোটখাট ব্যাপার নিয়েও তারা ঝুলে রইল, ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল তারা তেলের দাম কমানোর ব্যাপারে এখনই তেমন একটা উৎসাহী নয়।

'আমার ধারণা ব্যাটারা অন্য কারও সাথে ব্যবসা করার ফন্দি করেছে,' দীর্ঘ আলোচনা পর্বের শেষে ঘরে ফিরে হতাশ গলায় কথাটা বলল ক্লান্ত জুলিয়াস গ্রান্ট।

'হতে পারে,' ওর কথায় সায় দিল বব। 'তবে এখনই হাল ছেড়ে দেয়ার কিছু নেই। আমরা আরও কিছু টোপ ফেলব। যদি ব্যাটারা না গেলে তখন পরিস্থিতি

জানিয়ে যোগাযোগ করব লন্ডনের সাথে।'

সারাদিন মীটিং-এর ধকল সইতে হলেও বব একমুহূর্তের জন্যও তাহমিনার কথা ভুলতে পারেনি। ব্যবসার কথা ভুলে খালি মেয়েটির কথা মনে পড়ায় সে নিজেকে গোপনে বার কয়েক চোখও রাঙিয়েছে। একবার সন্দেহও জেগেছিল শেখ গত রাতে তাদের কাছে মেয়ে দু'টিকে ভেট হিসাবে পাঠায়নি তো? হয়তো ভেবেছে উপহার দিয়ে মন নরম করতে পারলে ব্যবসায়িক খানিক সুবিধে আদায় করে নেওয়া যাবে। এমন হওয়াটাও বিচিত্র কিছু নয়। তবে তাহমিনার কথা বব ভুলতে পারল না কিছুতেই, সারাক্ষণ মেয়েটির মিষ্টি চেহারাটা আয়নার মত ভেসে রইল চোখে। বব ঠিক করল, তাহমিনাকে যেভাবে হোক খুঁজে বের করবেই।

টিনাদের সম্মানে রাজকীয় ভূরিভোজের আয়োজন করল শেখ হারিদ ওইদিন সন্ধ্যায়। ডিনার পার্টিতে হারিদ ছাড়াও তার পেয়ারের উপপত্নীদের দেখা গেল নিজের দুই সন্তানসহ। পিতার মতই চেহারা পেয়েছে দুই ভাই। তবে ওরা অনেক রোগা। আর কচি গালে এখনও দাড়ি-গোঁফের রেখা ফোটেনি। ভূরিভোজের অনুষ্ঠানে রাজ্যের অনেক দামী মন্ত্রী-মিনিস্টার সহ গুরুত্বপূর্ণ অফিসাররা এসেও হাজির।

শেখের আতিথেয়তার সত্যি তুলনা হয় না। ছোটখাট মানুষটার চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ প্রবল, সুযোগ পেলেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এবারও তার ব্যত্যয় ঘটল না। সে যখন কথা বলল, গোটা অডিয়েন্স চুপ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। আমন্ত্রিত অতিথিদের সেবা-যত্নের ভার নিয়েছে কয়েকজন তরুণী। এদের সবার পরনে খাটো পোশাক, শরীরের বেশিরভাগ অংশ উন্মুক্ত। তারা বড় রূপোর থালায় করে খাবার পরিবেশন করছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে একদল অর্কেস্ট্রা প্রাচ্য সঙ্গীতের সুর লহরী তুলেছে। সব মিলে প্রথাগত একটা উৎসবের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে।

খাবারের সরবরাহ অঢেল, দেখেই বোঝা যায় অত্যন্ত দামী। বেশির ভাগই দেশীয় খাবার। টিনা শুধু কেভিয়ারটা চিনতে পারল। যদিও জীবনে এই প্রথম ব্যয়বহুল খাবারটির স্বাদ নিচ্ছে সে। একে একে এল শিকে গাঁথা এক ধরনের বিশাল সামুদ্রিক মাছ, প্লেট বোঝাই জিভে জল ঝরানো চিকেন কাবাব, রঙ ঝলমলে টসটসে অনেক ফল, যেগুলোর বেশির ভাগের নাম জানে না টিনা। সেই সাথে থাকল নানা স্বাদের, নানা রঙের বিদেশী মদের ঢালাও আয়োজন।

বব চুপচাপ, মাথা নিচু করে খেয়ে যাচ্ছিল। ওর পাশে বসে ছিল শেখের একান্ত সচিব হাসান। সে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, মি. ম্যাসন? আপনাকে আজ বড় বেশি চুপচাপ লাগছে!'

বব সিদ্ধান্ত নিল মনের কথাটা চেপে রাখবে না। হাসানকে আসল ঘটনা বলে একটু হালকা হতে চাইল ও।

'একটা ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারবে, হাসান?' জানতে চাইল

বব। 'গতকাল বাগানে একটা মেয়েকে আমার খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল, মনে আছে তার কথা?'

'মনে থাকবে না কেন? খুবই সুন্দরী ছিল মেয়েটি। শেখ হারিদ তার বাগানে সুন্দরীদের বিচরণই দেখতে চান সবসময়,' বলল হাসান। 'তো কী হয়েছে? মেয়েটিকে বুঝি খুব বেশি ভাল লেগে গেছে?'

'ঠিক তাই,' সিরিয়াস সুরে বলল বব। 'ওর সাথে আবার মিলিত হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি আমি। মেয়েটির সাথে আবার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারবে?'

পরিচয় হবার পরে, এই প্রথম হাসানকে হাসতে দেখল বব। তবে বড়ই রহস্যময় সে হাসি। ঠোঁটের কোনা দুটো সামান্য বেঁকে গেল মাত্র। অবশ্য এই ভঙ্গিটিকে যদি হাসানের হাসি বলে ধরে নেওয়া যায়!

'আপনার অনুরোধ সম্ভবত রক্ষা করা সম্ভব হবে না,' বলল সে ববকে। 'আপনি মেয়েটিকে একবার ভোগ করেছেন। ওকে আর কেউ ভোগ করার সুযোগ পাবে না। আল্লাহর ইচ্ছে হলো এটা। আর তাঁর ইচ্ছেতে আপনার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমি কোন্ ছার, স্বয়ং শেখ হারিদও এ ব্যাপারে আপনার কোন সাহায্যে আসবেন না।'

কথা শেষ করে ওখান থেকে চলে গেল হাসান। ব্যাপারটা নিয়ে তার সাথে আর আলোচনার সুযোগই পেল না বব। তবে হাসানের কথাগুলো গেঁথে রইল মনের ভিতর। ডিনার শেষে ঘরে ফেরার পরে হাসানের কথাগুলো মনে পড়তে বুকে জ্বালা ধরে গেল ববের। তাহমিনাকে দেখার ইচ্ছেটা আরও তীব্র হয়ে উঠল।

অবশেষে মনস্থির করে ফেলল বব, পায়ে নরম রাবারের জুতো গলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। চুপিসারে চলে এল পেছন দিকে একটা সিঁড়ি ঘরে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে। করিডরে ম্লান আলো জ্বলছে। আধো আলো আধো ছায়ায় গা বাঁচিয়ে বব চলে এল বিশাল প্রাসাদের পেছনের অংশে। সতর্ক ভঙ্গিতে আবার চলতে শুরু করল। ভৃত্য শ্রেণীর কেউ বা পাহারাদারদের কাউকে আসতে দেখলেই বড় খিলান বা থামের পেছনে আত্মগোপন করে রইল। শেষ পর্যন্ত একটা দরজা দেখতে পেল বব, এটার পরে উঠোন, তবে চারপাশে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। উঠোন পার হয়ে প্রাসাদের আরেকটা অংশে ঢুকে পড়ল বব। এদিকের করিডরগুলো বেশ সরু, দু'পাশে অনেকগুলো ঘর, সবগুলোর দরজা বন্ধ, যেন হোটেল একটা। এদিকে আগে একবার এসেছে বব। বন্ধ দরজাগুলো দেখে তখন সন্দেহ হয়েছিল ওর। বন্ধ দরজার ওপাশে কী আছে দেখতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল সে।

এ যেন খড়ের গাদায় সুচ খোঁজা। কিন্তু মনের খচখচানিটা দূর করতে নাছোড়বান্দার মত লেগে রইল সে। প্রতিটি বন্ধ দরজায় ঢুঁ মারল বব। কিছু দরজায় তালা মারা, কয়েকটা ঘরে শূন্য বেডরুম খাঁ খাঁ করছে। এতগুলো ঘর

দেখেও কোন ফল না পেয়ে হতোদ্যম বব করিডরের শেষ মাথায় চলে এসেছে, এমন সময় মনে হলো হাতের ধারের ঘরটা থেকে কেউ যেন গুঙিয়ে কাঁদছে। ঠিক ওর পেছনে, করিডরের সর্বশেষ ঘরটা থেকে গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে।

হাতল ধরে টান দিতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করছে বব, ওষুধের গন্ধ ধাক্কা দিল নাকে। ঘরটা তেমন অন্ধকার নয়। দূর প্রান্তের দেয়ালের সাথে লাগানো নিচু একটা খাট স্পষ্টই নজরে এল ওর। মৃদু গোঙানির আওয়াজটা আসছে ওদিক থেকেই। সেদিকে পা বাড়াতে শব্দটা আরও জোরাল হয়ে বাজল কানে, খাটে শোয়া মানুষটাকে চিনতে পেরে এবার ধক করে উঠল ববের বুক।

তাহমিনা! চোখ বুজে শুয়ে আছে। দ্রুত ওর দিকে ঝুঁকে এল বব, আরেকবার যন্ত্রণায় কাতরে উঠল মেয়েটা।

'তাহমিনা!' ফিসফিস করে ডাকল বব, কপালের উপর একটা আলতো হাত রাখল। প্রচণ্ড গরম।

'আমি বব। বলেছিলাম না তোমার সাথে আবার দেখা হবে।'

চোখ মেলে চাইল তাহমিনা, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, শেষে চিনতে পারল মানুষটাকে।

'ববি,' ফিসফিস করে ডাকল সে-ও। 'ওহ্, ববি, তুমি এখানে কেন মরতে এলে?'

সন্দেহ নেই, তাহমিনাকে প্রচুর সিডেটিভ দেওয়া হয়েছে। ফলে চোখ মেলে রাখতে খুব কষ্ট হচ্ছে ওর।

'আমি তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি,' বলল বব। 'কিন্তু তোমার কী হয়েছে? খুব যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝি?'

খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল বব, তাহমিনার হাতজোড়া তুলে নিল নিজের হাতে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে মেয়েটির। কম্বলে ঢাকা তাহমিনার উরুতে আরেকটা হাত রাখল বব আদর করে। সাথে সাথে হিম শীতল আতঙ্কে জমে গেল ও, ঘাড়ের কাছ থেকে যেন বরফ জল নামতে শুরু করল, পিছলে যেতে লাগল শিরদাঁড়া বেয়ে। হাতটা তুলে নিয়েছে বব, তাকিয়ে রয়েছে তাহমিনার কোমরের নীচের অংশের দিকে।

কম্বলে ঢাকা মেয়েটির ভরাট শরীরের রেখা এবং ভাঁজগুলো হঠাৎই যেন কোমরের কাছে এসে 'নেই' হয়ে গেছে। ওখানে কম্বলটা প্রায় নিভাঁজ এবং মসৃণ।

ইচ্ছের বিরুদ্ধে কম্বলটা আস্তে আস্তে টেনে তুলল বব। তাহমিনা এখনও নগ্ন, তার চওড়া কাঁধ বা সোনা রঙের দুই বুকের দিকে তাকালও না বব, তীব্র আতঙ্ক আর অবিশ্বাস নিয়ে চেয়ে রইল শরীরের নীচের অংশের দিকে। তাহমিনার কোমরের নীচের অংশটা সাদা ব্যান্ডেজে মোড়ানো, নিতম্বের ঠিক নীচে আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। হিপ বোনের নীচে, যেখানে সুগঠিত পা জোড়া থাকার কথা তাহমিনার, ওখানে একেবারে কিছু নেই। লম্বা, সুঠাম পা জোড়া নিখুঁতভাবে কেটে

ফেলে দেওয়া হয়েছে।

'ওহ, মাই গড!' গুঙিয়ে উঠল বব।

আবার চোখ মেলল তাহমিনা, মাথা তুলতে চেষ্টা করল। ওকে ড্রাগ দেওয়া হলেও, বব ভাল করেই জানে, নিজের চরম সর্বনাশের কথা অজানা নেই তাহমিনার।

'তুমি আমাকে এ অবস্থায় দেখবে তা আমি চাইনি, ববি,' দুর্বল গলায় বলল সে।

'আমার বাবাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে ওরা আমার পা দুটো কেটে নিয়ে গেছে।' বালিশে আবার মাথা রেখে নেতিয়ে পড়ল তাহমিনা। কম্বল দিয়ে ওর ক্ষতবিক্ষত শরীরটা ঢেকে দিল বব। হাঁটু গেড়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল সে। তাহমিনার চোখ বোজা। হয়তো ওষুধের প্রভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে। এক সময় উঠে দাঁড়াল বব, পা টিপে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দরজা বন্ধ করল। বুকের ভিতর ক্রোধ আর ঘৃণার আগুন জ্বলছে। একটা নিষ্পাপ মেয়েকে এভাবে কেউ শাস্তি দিতে পারে! অন্ধের মত হোঁচট খেতে খেতে সে এগোল নির্জন করিডর ধরে, নিজেকে আড়াল করে চলার প্রয়োজন বোধ করছে না। তবে ভাগ্য ভাল, কারও চোখে পড়ল না বব।

কোনমতে গ্রান্টের ঘরে এসে ঢুকল বব, হাঁপাতে হাঁপাতে খুলে বলল পুরো ঘটনা। মাঝে মাঝে জড়িয়ে গেল কথা, অশ্রুসজল হয়ে উঠল চোখ।

'এরা মানুষ না, পিশাচ!' ফুঁপিয়ে উঠল বব। 'আমি আগেই তোমাকে এ দেশটা সম্পর্কে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমার কথা পাত্তাই দাওনি।'

গ্রান্ট চেষ্টা করল ওকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু তাহমিনার কথা শুনে সে নিজেও অসুস্থ বোধ করছে, কেমন ভয় ভয় লাগছে।

'টিনা!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল বব। 'ওকে যেভাবে হোক এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে। শয়তানের বাচ্চাগুলোর মাথায় কী আছে বলা যায় না।'

টিনা ব্রিটিশ নাগরিক, শেখ ওর কোন ক্ষতি করতে পারবে না বা করবে না, এটা বন্ধুকে বোঝাতে ব্যর্থ হলো গ্রান্ট। বব তার সিদ্ধান্তে অটল থাকল। স্বৈরাচারের এই দেশে, পাষণ্ড একদল লোকের নাগালের মধ্যে টিনার নিরাপত্তা যে-কোন সময় বিঘ্নিত হতে পারে। কাজেই টিনাকে এখান থেকে সরাতেই হবে। ববের জেদের কাছে হার মানল গ্রান্ট। তারপর দু'জনে মিলে গেল টিনার ঘরে।

ঘুমাচ্ছিল টিনা। ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল বব। বলল বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে এখুনি ওকে এ জায়গা ত্যাগ করতে হবে। স্বভাবতই প্রতিবাদ করল টিনা। এমন কী ঘটেছে যে এত রাতে তাকে লট-বহর নিয়ে কাহরাইন ছাড়তে হবে? কিন্তু বব বা গ্রান্ট কেউই তাকে এ ব্যাপারে সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা দিল না। তবে বুদ্ধিমতী টিনা তার ভাইয়ার অস্থির চেহারা দেখে বুঝতে পারল মারাত্মক কিছু একটা নিশ্চই ঘটেছে, নইলে বব খামোকা উত্তেজিত হবার মত ছেলে নয়।

সে আর তর্কে না গিয়ে যাত্রার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিল।

খানিক পরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল টিনা। ওর মালপত্র বয়ে নিয়ে এল বব এবং গ্রান্ট। টিনার দেশ ভ্রমণের জন্য শেখ একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছিল আগেই, ওটাতে একরকম জোর করে বোনকে উঠিয়ে দিল বড় ভাই।

'শোন, টিনা,' জানালার কাছে মুখ এনে বলল বব। 'কোস্ট রোড ধরে সোজা উত্তরে ৬/৭ মাইল রাস্তা এগোবার পরে তুই কাহরাইন সীমান্তে পৌছে যাবি। সীমান্তের অন্য ধারে আনামের রাজধানী বসিরা। সীমান্ত থেকে মাইল দশেক দূরে হবে। ওখানে পৌছুতে বড় জোর ঘণ্টা খানেক লাগবে। ওখান থেকে সোজা গিয়ে উঠবি ব্রিটিশ কনস্যুলেট অফিসে। আমরা না আসা পর্যন্ত ওখানে অপেক্ষা করবি। কাল বা পরশুর মধ্যে আমরা চলে আসব।'

'আসলে তোমরা কী করতে চাইছ, বলো তো?' প্রতিবাদ করল টিনা। 'শেখ যখন দেখবে আমি না বলে চলে গেছি তখন কী ভাববে?'

'তা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। আমরা যা বলার শেখকে বলব। তোকে যা যা করতে বললাম করিস। খবরদার কোথাও গাড়ি থামাবি না। এখন আয় তবে।'

বিরক্ত চেহারা নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল টিনা, বেরিয়ে গেল প্রাসাদ গেট ছেড়ে, এক সময় ওদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওর বাহন। গেটে অবশ্য ওকে কেউ আটকাল না। কারণ শেখের কড়া নির্দেশ আছে টিনা যখন খুশি গাড়ি নিয়ে শহর দেখতে বেরুতে পারবে। সে ড্রাইভার সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। নাইট গার্ড ভেবেছে ব্রিটিশ নন্দিনীর হয়তো রাতের রাজধানী দেখার শখ হয়েছে। তাই সসম্ভ্রমে সে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে।

টিনা চলে যাবার পরে বব ও গ্রান্ট ধীর পায়ে ফিরে চলল প্রাসাদের দিকে। দু'জনেই মাথা নিচু করে কী যেন ভাবছে।

'টিনার ব্যাপারে কী ব্যাখ্যা দেবে তুমি হারিদকে?' নিজেদের ঘরে ঢুকে প্রথমেই এ প্রশ্নটা করে বসল গ্রান্ট ববকে। 'তেলের মূল্য হ্রাসের ব্যাপারে আমাদের আলোচনা এখনও শেষ হয়নি। কথাটা ভুলে যেয়ো না।'

'গুল্লি মারো তোমার তেলের মূল্য হ্রাস,' খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল বব। 'আমি ভাবছি বেচারী তাহমিনার কথা আর উনি ব্যবসার চিন্তা করছেন! ওই মেয়েটা যে মারা যেতে চলেছে সে ব্যাপারে ভেবেছ কিছু?'

ঘড়ির দিকে তাকাল বব, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আধঘণ্টার বেশি হয়ে গেছে। টিনার এতক্ষণে সীমান্ত পার হয়ে যাবার কথা। বিপদের হাত থেকে বোনটা তার এখন সম্পূর্ণ মুক্ত।

'আমি আবার তাহমিনাকে দেখতে যাচ্ছি,' ঘোষণা করল বব। 'তুমি আমার সাথে আসবে, জুলিয়াস?'

ওকে বলেও নিবৃত্ত করা যাবে না, বুঝতে পেরে শেষে ববের সঙ্গী হতে রাজি হলো জুলিয়াস গ্রান্ট। এবার শুরু হলো যৌথ অভিযান।

চেনা রাস্তা দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না, নৈশ প্রহরীর চোখ বাঁচিয়ে দু'জনে চলে এল তাহমিনার ঘরের কাছে। দরজা ভেজানো দেখে অবাক হলো বব। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল কবাট, সেই সাথে উদ্ঘাটিত হলো ভেজানো দরজা রহস্য।

হাসান তার দুই সশস্ত্র গার্ডকে নিয়ে দরজার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছে নিচু খাটটির সামনে।

'শুয়োরের বাচ্চারা!' বব থুথু ছিটাল ওদের গায়ে। 'তোরা এ কী করেছিস?'

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরল হাসান, তারপর ববদের দেখে ঢিল দিল পেশিতে।

'এখানে আসা আপনাদের মোটেও উচিত হয়নি,' হুমকির সুরে বলল সে। 'এই ঘর চিনলেন কী করে?'

'ব্যস, এটুকু বললেই হয়ে গেল?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল বব। 'দেখ্, তোরা অসহায় মেয়েটার কী দশা করেছিস!' সে আঙুল তুলে তাহমিনাকে দেখাল।

'বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু,' থমথমে গলায় বলল হাসান। 'আপনারা শেখ হারিদের আতিথ্যের মর্যাদা রাখছেন না। সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছেন। এ জন্যে আপনাদেরকে পস্তাতে হবে। এখুনি যে যার ঘরে ফিরে যান বলছি!'

বব সিনা টানটান করে দাঁড়িয়ে থাকল। 'তোমরা কেন তাহমিনার এই দশা করেছ সে ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত আমি কোথাও যাচ্ছি না।'

'আমি আপনাকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য নই, তবে ভদ্রতার খাতিরে বলছি শুধু,' বলল হাসান ঠাণ্ডা গলায়। 'তবে ব্যাখ্যাটা শোনার পরে কিন্তু আপনাদেরকে চলে যেতে হবে। এই মেয়েটির বাবা শেখ হারিদের বিরুদ্ধে নিজের পত্রিকায় যা-তা লিখেছে। কাজেই তার শাস্তি পাওনা হয়েছিল। সে নিজে বা অন্যরা যাতে এ ধরনের কাজ করতে আর সাহস না পায় সে জন্যে আমরা বুড়োর মেয়েকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসি।'

'কিন্তু ওর পা কাটলেন কেন?' প্রশ্ন করল গ্রান্ট।

'এ সবই আল্লাহর ইচ্ছে,' সোজাসাপ্টা জবাব হাসানের। 'শেখ নিজে একজন বিনয়ী, ভদ্র মানুষ। এ ধরনের অপরাধে, তিনি মনে করেন না যে যথার্থ শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে। তাই সমস্ত বিচারের ভার তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার ওপর ছেড়ে দেন। এই মেয়েটি ছাড়াও অন্যান্য যে সব মেয়ে আছে, তাদের পরিবারের অপরাধের অভিযোগে ওই মেয়েগুলোকে শেখ আটক করে রেখেছেন তাঁর বাগানে। এদের অনেককেই এক বছর পরে মুক্ত করে দেয়া হবে কোন ক্ষতি না করেই। তবে এই এক বছরে শেখের মেহমানদের চোখে যদি কেউ লেগে যায়, তা হলে তাদের কপালে শাস্তি জুটবে। শেখ মেহমানদারীর নিদর্শন হিসেবে পছন্দসই মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেন তাঁর অতিথির ঘরে। তবে তার আগে তিনি জিজ্ঞেস করে জেনে নেন মেয়েটির শরীরের কোন্ অঙ্গটি মেহমানের কাছে সবচে' দৃষ্টি আকর্ষক মনে হয়েছে। তারপর মেয়েটির সাথে অতিথির রাত্রি-যাপনের পরে সেই অঙ্গটি মেয়েটির শরীর থেকে অপারেশন করে বাদ দেয়া হয়। মেয়েটি

মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠলে শেষে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয় আল্লাহর জীবন্ত বিচারের নিদর্শন হিসেবে।' একটু থেমে আবার শুরু করল সে, 'আপনি মি. ম্যাসন, তাহমিনা নামের মেয়েটিকে পছন্দ করেছেন, শেখ নন। আপনিই তাহমিনার সুঠাম পায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন, কাজেই আপনিই আল্লাহর মুখপাত্র হিসেবে মেয়েটির ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।'

'ইউ ক্রুয়েল বাস্টার্ডস,' নিজেকে সামাল দিতে না পেরে গর্জে উঠল বব। 'তোরা নিজেদের বিনোদনের জন্যে কচি মেয়েগুলোকে নিয়ে এই বীভৎস খেলা খেলছিস অথচ দোষ চাপাচ্ছিস সৃষ্টিকর্তার ঘাড়ে। এর চরম হিসেব দিতে হবে তোদের সবাইকে।'

দাবড়ে উঠল হাসান, 'ভদ্র ভাষায় কথা বলুন, মি. ম্যাসন। আপনার অশোভন আচরণের কথা শেখের কানে গেলে তিনি কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সহজ ভাবে নেবেন না।' বলতে বলতে কঠোর হয়ে উঠল হাসানের চেহারা। ঘৃণায় মুখ বাঁকাল সে। 'আপনারা যে এত ফাল পাড়ছেন, আপনাদের মত পুঁজিবাদীদের আমাদের খুব ভাল চেনা আছে। টাকা আর লাভের ব্যাপার থাকলেই সেখানে আপনারা লাফিয়ে পড়েন। যাকগে, বাজে কথায় অনেক সময় নষ্ট করেছি। অশ্লীল গালিগালাজ করার জন্যে এখন আমার কাছে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে। তা হলে আপনাদের বিরুদ্ধে আমি শেখের কাছে নালিশ জানাব কি জানাব না সে ব্যাপারটা একবার বিবেচনা করে দেখতে পারি।'

লোকটার দম্ভ আর সহ্য হলো না ববের। প্রচণ্ড রাগে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল ওর। অসতর্ক গার্ডের উপর লাফিয়ে পড়ল সে, এক ঘুষিতে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে হোলস্টার থেকে দ্রুত রিভলভার বের করে নিল। তবে ট্রিগার টেপার আগেই হাসান ওর হাত চেপে ধরল। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। হঠাৎ সশব্দে বিস্ফোরিত হলো রিভলভার, টানাটানির চোটে ট্রিগারে লেগে গেছে আঙুল, হাসানের চেহারায় ফুটে উঠল বিস্ময়ের ভাব, পরক্ষণে তীব্র ব্যথার অভিব্যক্তি গ্রাস করল অবাক হবার অনুভূতিকে; বুক চেপে ধরে মেঝের উপর শুয়ে পড়ল সে। আর নড়ল না।

'সর্বনাশ! লোকটাকে মেরে ফেলেছ দেখছি।' আঁতকে উঠল গ্রান্ট।

'ওকে আমি গুলি করতে চাইনি। তবে ইঁদুরটা মরেছে, ভালই হয়েছে।' রিভলভার হাতে গার্ড দু'জনকে কাভার করতে করতে বলল বব। রাগ কমেছে অনেকটাই। তবে হাসানের মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র আফসোস হচ্ছে না।

'আমাদের এখুনি কেটে পড়া দরকার,' পরামর্শ দিল গ্রান্ট।

'তাহমিনার কী হবে?'

'ধরা পড়ে গেলে ওর জন্যে কিছুই করতে পারব না। আগে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি চলো। সম্ভব হলে বাইরে থেকে সাহায্য নিয়ে আসব।'

গ্রান্টের কথায় যুক্তি আছে। ওরা গার্ড দু'জনের মুখ আর হাত পা বেঁধে ফেলে রাখল মেঝের উপর। ঘুমন্ত তাহমিনার কপালে চুমু খেয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার

আগে বাইরে থেকে দরজায় তালা মারতে ভুল করল না। দূর থেকে চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে আসছে, অনেকগুলো বুটের শব্দও শুনতে পেল বব ও গ্রান্ট। এদিকেই আসছে। ওরা করিডর ধরে দৌড়াতে শুরু করল। কিছুদূর এগোবার পরে একটা দরজা চোখে পড়ল। প্রাসাদের বাগানের সাথে লাগোয়া। তাড়া খাওয়া খরগোশের মত দু'জনে ছুটল বাগান লক্ষ্য করে। জান বাজি রেখে বাগান ঘেরা দেয়ালে উঠে পড়ল হাচড়ে পাচড়ে। তারপর লাফ দিয়ে নামল দেয়ালের অপর পাশের সরু গলিতে। আবার ছুট দিল। গন্তব্য জেটি।

বেশ অনেকটা রাস্তা ছুটে আবার পরে পেছন ফিরে তাকাল বব ও গ্রান্ট। প্রাসাদ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে ওরা। ধাওয়াকারীদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ওরা নির্বিঘ্নেই জেটিতে চলে এল।

'সাগর পথে পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল গ্রান্ট। চাঁদের আলোয় সার বাঁধা ডিঙ্গি নৌকা দেখা যাচ্ছে।

বব সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। পাল তোলা একটা নৌকা বেছে নিল ওরা। বাতাস বইছিল ওদের অনুকূলেই। দেখতে দেখতে উপকূল পার হয়ে খোলা সাগরে চলে এল নৌকা।

ববরা কল্পনাও করেনি এত সহজে পালাতে পারবে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দূরে ফুটকির মত অসংখ্য তারা জ্বলছে। কাহরাইন শহরের আলো। পাহাড়ের উপর প্রাসাদটিকেও আবছা দেখা যাচ্ছে। নৌকা যত খোলা সাগরের দিকে এগোল, পেছনের দৃশ্যপট ততই আবছা হয়ে এল।

ববদের ইচ্ছে উত্তরের দিকে যাবে কাহরাইনকে পেছনে ফেলে। আশা করছে নিরাপদেই তীরে পৌছুতে পারবে। কিন্তু হঠাৎ তীব্র বাতাস ওদের ঠেলে নিয়ে চলল দক্ষিণ দিকে। রাত পার হয়ে ভোর হলো, গড়িয়ে এল দুপুর এবং বিকেল। একভাবে ভেসে যেতে লাগল নৌকা। সূর্য তাপে দগ্ধ, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাহিল ওরা দু'জন জানে না কোনদিকে চলেছে। টানা দু'দিন অসহ্য মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করার পরে ভাগ্য দেবী মুখ ফেরালেন ওদের দিকে। পানামার একটা ট্যাঙ্কার লক্ষ্যহীন ভাবে ওদেরকে ভাসতে দেখে তুলে নিল নিজেদের জাহাজে, নামিয়ে দিল আবাদানে।

আবাদান থেকে বসিরায় যখন ফিরে এল বব ও গ্রান্ট ততদিনে চার দিন পার হয়ে গেছে। ওরা সোজা গিয়ে ঢুকল ব্রিটিশ কনস্যুলেট অফিসে। ভয়, দুশ্চিন্তা এবং আতঙ্ক গ্রাস করল যখন জানল টিনা ম্যাসন নামে কোন মেয়ে আসেনি এখানে।

সে রাতে টিনা আসলে কাহরাইন ছেড়ে বেরুতেই পারেনি, হঠাৎ গাড়ি নষ্ট হয়ে যাবার কারণে। বলা নেই কওয়া নেই, একটা চাকা পাংচার হয়ে গেল। গাড়িতে অতিরিক্ত চাকার ব্যবস্থা না থাকায় হতাশ হয়ে দৈব সাহায্যের আশায় বসে থাকতে হলো টিনা ম্যাসনকে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে পুলিসের একটা গাড়ি আসতে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল টিনা। হাত তুলে গাড়ি থামাল সে। দু'জন পুলিস অফিসার নামল গাড়ি থেকে। সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল টিনার দিকে। একজন গাড়িতে ফিরে গেল। অয়ারলেস সেটে খানিকক্ষণ হুঁ হাঁ করে আবার এসে দাঁড়াল টিনার সামনে। বলল, 'সরি, মিস। আপনাকে আমাদের সঙ্গে একটু থানায় যেতে হবে।'

টিনার প্রতিবাদ ওরা গায়েই মাখল না, জোর করে গাড়িতে তুলল। তবে থানা নয়, পুলিসের গাড়ি ছুটে চলল শেখ হারিদের প্রাসাদ লক্ষ্য করে।

প্রাসাদে পৌঁছার পরে টিনাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ছোট, নোংরা একটি ঘরে। বাইরে থেকে তালা মেরে দিল গার্ড।

পরদিন সকালে শেখ হারিদকে লাল টকটকে চেহারা নিয়ে আসতে দেখে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল টিনার। সে জানে না তার অপরাধটা কী। যার জন্য এ ক'দিন রাজকীয় আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাকে কেনই বা জেলখানার মত ঘরে পুরে রাখা হলো। প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল টিনা, এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিল শেখ। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোমার ভাই আমার সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে। ওকে বাঁচাতে চাইলে আমি যা যা বলব সব তোমাকে করতে হবে। নইলে তার এমন অবস্থা করব সারা জীবন পস্তাতে হবে।'

তার ভাই শেখ হারিদের কী ক্ষতি করেছে ভয়ে ভয়ে জানতে চেয়েছিল টিনা, কিন্তু শেখ সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হুমহাম করে চলে গেল।

শেখ চলে যাবার পরে টিনার জামা-কাপড় খুলে তাকে নগ্ন করা হলো। প্রাসাদের চাকরানীরা ওকে গোসল করাল, গায়ে পারফিউম মেখে দিল। তারপর নগ্ন অবস্থায় হাঁটিয়ে নিয়ে গেল প্রাসাদের পেছনের বাগানে। টিনা অবাক হয়ে দেখল এখানে আরও গোটা বিশেক মেয়ে আছে যাদের গায়ে এক চিলতে কাপড় নেই। এই মেয়েগুলোর সাথে বাগানে একত্রে থাকতে বাধ্য করা হলো টিনাকে। ভাইয়ের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত টিনা মুখ বুজে সব সহ্য করল।

দুটো দিন কেটে গেল এভাবেই। তৃতীয় দিন সকালে বিশালদেহী এক নিগ্রোকে নিয়ে শেখ হারিদ ঢুকল স্বর্গ উদ্যানে। হারিদকে দেখে বাগানের মেয়েরা টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। টিনাকে আগেই বলা হয়েছে কী করতে হবে। সে-ও পাথরের মূর্তি বনে গেল। তবে লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে গেছে। অভিজ্ঞতাটি তার কাছে আরও বিব্রতকর হয়ে উঠল যখন শেখ তাকে ডেকে পাঠাল দৈত্যের মত নিগ্রোর সামনে। নিগ্রো মেহমানের সামনে বাধ্য হলো টিনা প্যারেড করতে। টের পেল লোকটা লোভাতুর চোখে তাকে গিলছে।

'আপনার রুচির তারিফ করতেই হয়, মি. রিচার্ডসন,' আমেরিকান নিগ্রোর উদ্দেশে বলল শেখ হারিদ টিনার গোলাপি, মসৃণ ত্বকে হাত বোলাতে বোলাতে।

'তো এই সুন্দর মেয়েটির শরীরের কোন্ অঙ্গটি আপনার সবচে' পছন্দ হয়েছে?'

'মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী সন্দেহ নেই,' ঠোঁট চাটল দানব। 'তবে ওর বুক দুটি

ভারি সুন্দর আর...'

সে বিরতি দিল।

'আর?' সাগ্রহে জানতে চাইল শেখ।

'ওর নীল চোখ জোড়াও অসাধারণ!'

খুনে ক্যাকটাস

ক্যাকটাসটাকে দেখেই পছন্দ হয়ে গেল নাদিয়ার। ওদের লিভিং রুমের কোণে বাড়তি একটা আকর্ষণ হিসাবে মানাবে দারুণ।

নতুন বিয়ে করেছে নাদিয়া আর নাসিম। সস্তায় ফ্ল্যাট ভাড়া পেয়ে গেছে রায়ের বাজারে। পাঁচতলা বাড়ি। ওরা পঞ্চমতলায় থাকে। তিন দিকে বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালে বুড়িগঙ্গা দেখা যায়। সারাক্ষণ ফুরফুরে বাতাস বইছে। এই গরমেও ফ্যানের তেমন প্রয়োজন হয় না। বারান্দায় শখ করে কয়েকটা ফুলের টব সাজিয়ে রেখেছে নাদিয়া। ঢাকা কলেজের সামনে এসেছিল বোগেন ভেলিয়ার একটা টব কিনতে। এই সময় চোখে পড়ে গেল ক্যাকটাসটা।

'বৃক্ষালয়' নামে একটা দোকান আছে কলেজটার পাশে। দুষ্প্রাপ্য নানা জাতের গাছের চারা বিক্রি করে। নতুন দোকান। আগে কখনও আসেনি নাদিয়া। ফুটপাথ থেকে তার পছন্দের টব কিনবে বলে এসেছিল। চোখ আটকে গেল দোকানের কাঁচের ভিতরে। প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা ক্যাকটাসটাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। তবে কাছে গিয়ে দেখল ঠিক ক্যাকটাস মনে হচ্ছে না ওটাকে। বড় বড় সবুজ পাতা, গায়ে ছোট ছোট কাঁটা। দোকানি ছেলেটা বলল তেমন আলো-বাতাসের দরকার নেই ক্যাকটাসটার জন্য। আর দামও বেশ সস্তা। মাত্র দুই হাজার টাকা। এত বড় ক্যাকটাস কোনদিন দেখেনি নাদিয়া। নাসিমকে বেশ চমকে দেওয়া যাবে, ভাবল সে।

'কী জাতের ক্যাকটাস এটা?' জানতে চাইল নাদিয়া।

'আমি ঠিক জানি না, আপা,' জবাব দিল দোকানি। 'এইটা বিদেশ থিকা আইছে গত সপ্তায়। আরও কয়েকটা আনছে আমার মালিকে। হেইগুলা উনি বিক্কিরি কইরা দেছেন। অহন তো মালিকে দোকানে নাই। তয় আমারে কইছে দুইয়ের কমে বিক্কিরি না করতে।'

ছেলেটার বকবকানির অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে নাদিয়া দু'হাজারেই কিনে নিল ক্যাকটাস। একটা ভ্যানে করে নিয়ে এল বাড়িতে। পেছনের রিকশায় থাকল নাদিয়া। অনেকেই কৌতূহলী চোখে তাকাল ভ্যানের দিকে। এতবড় ক্যাকটাস সচরাচর চোখে পড়ে না বলেই হয়তো।

নাদিয়াদের ফ্ল্যাটে লিফট নেই। দারোয়ানের ব্যবস্থাও নেই। কলাপসিবল

গেট ভাড়াটেরা নিজেই খোলে আবার তালা মেরে রেখে যায়। ভ্যানঅলাকে বলে লাভ হলো না। সে পাঁচতলায় উঠতে পারবে না। অগত্যা নাদিয়াকেই বইতে হলো ক্যাকটাসটা। জান বেরিয়ে গেল পাঁচতলা পর্যন্ত উঠতে। খুব ভারী গাছটা। লিভিংরুমে ঢুকে কিছুক্ষণ হাঁপাল নাদিয়া। হঠাৎ মনে হলো গুণগুণ একটা শব্দ আসছে গাছটার কাণ্ড থেকে। একটু পরেই থেমে গেল। ক্যাকটাসটার দিকে এগিয়ে গেল নাদিয়া। কান পাতল। না, কোন শব্দ নেই। অতিরিক্ত পরিশ্রমে আমার মাথার ভিতরে আসলে ড্রাম বাজছিল, ভাবল সে। ভেবেছি ক্যাকটাস থেকে শব্দ আসছে। ফুলস্পীডে ফ্যান চালু করে দিল সে। খানিক জিরিয়ে নতুন উদ্যমে লেগে গেল কাঁটা গাছটাকে নিয়ে।

বিকেলে বাড়ি ফিরে গাছটা দেখে রোমাঞ্চিত হলো নাসিম। মাঝে মাঝে ওরা ঘর সাজানোর টুকটাক জিনিস কিনে আনে বাজার বা মেলা থেকে। লম্বা, অদ্ভুত চেহারার এই উদ্ভিদটাকে লিভিংরুমের এক কোণে সাজিয়ে রেখেছে নাদিয়া। ঘরের চেহারা বদলে গেছে অনেকটা। অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করল সে স্ত্রীর। মিমিকে গাছটার ছায়ায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকতে দেখে হাসল। মিমি নাদিয়ার আদরের দুই বেড়ালের বড়টা। আরেকটার নাম কিমি। মিমি মোটাসোটা সিয়ামিজ জাতের বেড়াল, সাংঘাতিক আরামপ্রিয়। কোথাও বসার সুযোগ পেলেই হলো, ঘুমিয়ে কাদা। কিমি দুষ্টু প্রকৃতির। মিমির চেয়ে ছোট। বয়সে, আকারে–দুটোই। যে পটে গাছটাকে দাঁড় করানো, ওটার পাশে ঘুরঘুর করছিল কিমি। নাক ঘষতে গিয়ে কাঁটার খোঁচা খেয়ে আঁতকে উঠে পিছিয়ে এল। সহসা আর ওটার ধারে কাছে দেখা গেল না তাকে।

ক্যাকটাস কিনে আনার কয়েকদিন পরের ঘটনা। সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নাদিয়া দেখল মিমিকে কেমন অসুস্থ লাগছে। নাস্তার টেবিলে মিমির এক বাটি দুধ চাইই। কিন্তু আজ সে গাছটার নীচে বসে রইল চুপচাপ, নড়াচড়ার লক্ষণ নেই।

অবাক হলো নাদিয়া। মিমিকে ডেকেও লাভ হলো না। দুধের বাটিতে মুখ ছোঁয়াল না ওটা। অসম্ভব দুর্বল দেখাচ্ছে।

দুপুরেও মিমি কিছু মুখে তুলল না দেখে উদ্বেগ বোধ করল নাদিয়া। নাসিমের অফিসে ফোন করল। তার শঙ্কাকে হেসেই উড়িয়ে দিল নাসিম। বলল, 'আরে, তোমার মিমি যা অলস! বেশি খেতে খেতে বোধহয় খাবারে অরুচি ধরে গেছে।'

কিন্তু বিকেলে অফিস থেকে ফিরে সে বুঝতে পারল নাদিয়ার চিন্তা অমূলক নয়। অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটেছে বেড়ালটার। চোখ-টোখ উল্টে গেছে, ঠোঁটের কোণ বেয়ে লালা ঝরছে। কিমির মধ্যেও অস্থির একটা ভাব লক্ষ করল সে। সঙ্গীর অসুস্থতার জন্য এরকম করছে কিমি, ভাবল নাসিম। তবু অসুস্থ মিমির সাথে কিমিকেও নিয়ে সে আর নাদিয়া ছুটল পরিচিত পশু ডাক্তারের কাছে।

পশু ডাক্তার মি. জামশেদুর রহমান কিমিকে দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হৃৎপিণ্ড ধুক্‌পুক্‌ করছে। কিমি একটু পাগলাটে আচরণ করলেও তাকে নিয়ে শঙ্কিত

হওয়ার কোন কারণ নেই বলে অভয় দিলেন তিনি স্বামী-স্ত্রীকে। বললেন, 'আপনারা মিমিকে রেখে যান। ওকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কাল সকালে একবার আসুন। রিপোর্ট পেয়ে যাবেন।'

কিন্তু মিমি সকাল পর্যন্ত টিকল না। ডাক্তারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মারা গেল সে রাতেই। জামশেদুর রহমান শত ভেবেও মিমির মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারলেন না। অসহায়ের মত দেখলেন পা দাপড়াতে দাপড়াতে মরে গেল মিমি।

মিমির মৃত্যু সংবাদ শুনে কেঁদে-কেটে সারা হলো নাদিয়া। কৈশোরের খেলার সাথী ছিল নাদুসনুদুস বেড়ালটা। তবে মিমিকে নিয়ে বেশি শোক প্রকাশের সময় পেল না সে। কারণ কিমিও মিমির মত দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করেছে। মুখ দিয়ে লালা ঝরছে, চোখের মণি হয়ে উঠেছে লাল এবং ঘোলাটে। সে চুপ্‌চাপ্‌ শুয়ে ছিল ক্যাকটাসটার নীচে। নাদিয়ার শত ডাকাডাকিতেও উঠল না। যেন চরম আলস্যে পেয়েছে। ভয়ে আত্মা উড়ে গেল নাদিয়ার। কিমির লক্ষণ মোটেই সুবিধের নয়। শনিবার, অফিস বন্ধ, নাদিয়া নাসিমকে নিয়ে চলল কিমিকে ডাক্তার দেখাতে।

জামশেদ সাহেবের কাছে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলল নাদিয়া। কিমিরও যদি মিমির মত অবস্থা হয় তা হলে সে আর বাঁচবে না, ফুঁপিয়ে উঠল সে।

সান্ত্বনা দিলেন ডাক্তার। 'শান্ত হোন, মিসেস ইসলাম। ব্যাপারটা একটু খোলাসা করে বলুন আমাকে। প্রায় একই সাথে দুটো বেড়ালের অসুস্থ হয়ে পড়াটা অস্বাভাবিক ব্যাপারই বটে। তাই আমি শুনতে চাই সব কথা। তার আগে বলুন ওরা এমন কিছু কি খেতে পারে যাতে ফুড পয়জনিং-এর শিকার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল?'

'না,' রুমাল দিয়ে চোখ মুছল নাদিয়া। 'ওরা খুব ভদ্র বেড়াল। আজে বাজে কোন কিছুতে মুখ দেয় না। এমনকী আরশোলা দেখলে তাড়া করে মেরে ফেলে কিন্তু মুখ ছোঁয়ায় না।'

তারপর ক্যাকটাসটার কথা বলল নাদিয়া। 'ওটাকে নিয়ে আমার সন্দেহ হয়। গাছটার নীচে শুয়েছিল মিমি, কিমি দু'জনেই। তারপর থেকে ওদের এই অবস্থা। গাছটার ভেতরে অদ্ভুত সব শব্দ হতে শুনেছি আমি।'

'ও আপনার মনের ভ্রান্ত ধারণা,' বললেন পশু চিকিৎসক। 'টেনশনে ছিলেন আপনি আপনার প্রিয় দুটি পোষা প্রাণীকে নিয়ে। তাই হয়তো কল্পনায় অনেক কিছু শুনেছেন। যাকগে, ভয় পাবেন না। আমি কিমিকে একটা ইনজেকশন দিচ্ছি। ফুড পয়জনিং জাতীয় কিছু হলে বিষক্রিয়াটা কাটতে শুরু করবে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা যদি ফুড পয়জনিং না হয়,' বাধা দিল নাসিম, 'মিমিকে তো আপনি বাঁচাতে পারেননি।'

'একেবারে শেষ সময়ে ওকে নিয়ে এসেছিলেন আপনারা,' গম্ভীর হয়ে গেলেন ডা. জামশেদ। 'আমার করার কিছু ছিল না। তবে কিমির অবস্থা এখনও অতটা

খারাপ নয়। আমি মিমির অটোপসি করব। মৃত্যুর কারণটা জানা গেলে হয়তো কিমির বিপদটা এ যাত্রা কাটিয়ে উঠতে পারব আমরা।'

ওরা কিমিকে রেখে ফিরে এল বাড়িতে। খুব মন খারাপ হয়ে আছে নাদিয়ার। ওর মানসিক কাতরতা নাসিমকেও স্পর্শ করেছে। বেড়াল দুটোকে ছাড়া খালিখালি লাগছে ঘর। আর কিছু করার না পেয়ে টিভি খুলে বসল নাসিম। জোর করে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করল স্যাটেলাইটের বিনোদন চ্যানেলগুলোতে। ক্যাট ফুডের একটা বিজ্ঞাপন দেখাতে অশ্রুসজল হয়ে উঠল নাদিয়ার চোখ। রুমাল দিয়ে বারবার চোখ মুছল ও।

নাসিম আড়চোখে তাকাল লিভিংরুমের দক্ষিণ কোণের দিকে, ক্যাকটাসটাকে রাখা হয়েছে যেখানে কল্পনার চোখে দেখতে চেষ্টা করল কিমি ওখানে বসে ঘুমাচ্ছে। এসব আবোল তাবোল ভাবছে নাসিম, হঠাৎ নড়ে উঠল গাছটা।

চোখ বন্ধ করে ফেলল নাসিম, আবার খুলল। না! ভুল দেখেনি সে। উদ্ভিদটা নড়ছে এখনও, খুবই আস্তে।

টিভির দিকে চোখ ফেরাল নাসিম।

আবার তাকাল ক্যাকটাসের দিকে। ওটা সত্যি সত্যি নড়ছে!

নাদিয়ার দিকে ফিরল নাসিম। নাদিয়া কি দেখেছে দৃশ্যটা? নাকি না দেখার ভান করে জোর করে চোখ জোড়া সেঁটে রেখেছে টিভি পর্দায়?

'নাদিয়া,' ফিসফিস করে ডাকল নাসিম।

'গাছটার কী হয়েছে?'

'কীসের গাছ?' টিভি পর্দায় চোখ নাদিয়ার।

'ওই যে ঘরের কোনায় কিম্ভূত যে জিনিসটা খাড়া করে রেখেছ তুমি। ওটা নড়ছে। দেখতে পাচ্ছ?'

ঝট্ করে ঘাড় ঘোরাল নাদিয়া। আগু পিছু শুরু করেছে ক্যাকটাস, কাঁপছে কাঁটাঅলা শরীর। যেন ভিতর থেকে অদৃশ্য কোন হাত ধরে নাড়াচ্ছে ওটাকে।

'নড়ছে!' বিস্মিত শোনাল নাদিয়ার কণ্ঠ।

'নড়ছে ওটা সত্যি!'

হঠাৎ প্রবল বেগে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল ক্যাকটাস, সারা ঘরে অদ্ভুত একটা গুমগুম শব্দ ছড়িয়ে পড়ল সাথে সাথে।

'নাদিয়া,' বলল নাসিম। 'গাছটাকে যে দোকান থেকে কিনেছ সেখানে একটু ফোন করে দেখো তো। ভাবগতিক ভাল ঠেকছে না আমার। জীবনেও শুনিনি গাছেরা নড়াচড়া করতে পারে!'

'এখন লাইন এনগেজ করে রাখা কি ঠিক হবে?' বলল নাদিয়া। 'ডাক্তার সাহেব যে কোন সময় ফোন করতে পারেন।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল নাসিম। অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'এই জিনিস নিয়ে ঘরে থাকতে পারব না আমি। দেখছ না কী রকম নাচানাচি শুরু করেছে? মেঝের ওপর ব্রেক ড্যান্স না আরম্ভ করে দেয়! তুমি ফোন করতে না পারলে আমাকে

দাও।'

আর কথা না বাড়িয়ে ফোনের ইনডেক্স বের করে 'বৃক্ষালয়'-এর নাম্বার খুঁজে নিল নাদিয়া। দোকানি ওকে কার্ড দিয়েছিল একটা। বলেছিল নতুন কোন দুষ্প্রাপ্য গাছের খোঁজ নিতে চাইলে নাদিয়া ফোন করতে পারে।

'হ্যালো, এটা কি...নম্বর?' শুধাল নাদিয়া। একটু বিরতি। তারপর সে বলল, 'আমি আপনাদের দোকান থেকে হপ্তা খানেক আগে একটা পাঁচ ফুট লম্বা ক্যাকটাস কিনেছিলাম...'

নাসিম লক্ষ করল ওপ্রান্তের কথা শুনতে শুনতে নাদিয়ার মুখের রঙ বদলাতে শুরু করেছে। মুখখানা সাদা কাগজ হয়ে উঠল, রক্ত সরে গিয়েছে। হাত থেকে রিসিভার খসে পড়ল।

'নাসিম...' ঢোক গিলল নাদিয়া। 'এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। শিগগির বাইরে চলো...'

'আরে, তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি? আমি ক্যাকটাসটাকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলাম। তুমি দেখছি সিরিয়াসভাবে নিয়েছ ব্যাপারটাকে।'

'নাসিম, প্লিজ। বাইরে চলো এক্ষুণি। ঠাট্টা নয়, ভয়াবহ একটা কথা শুনেছি আমি, চলো, চলো!'

নাসিমকে প্রায় টানতে টানতে ঘর থেকে বের করে আনল নাদিয়া। ঝড়ের বেগে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। রাস্তায় এসে হাঁপাতে লাগল।

'কী হয়েছে? কী ভয়াবহ কথা শুনেছ?' অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল নাসিম।

'ওই ক্যাকটাস...' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নাদিয়া। 'ওগুলোকে মেক্সিকো থেকে আনা হয়েছে আর...'

'আর কী?'

'ওদের পেট ভর্তি ডিম...'

'ডিম! কীসের ডিম?'

'ট্যারানটুলার ডিম। দোকানি তাই বলল, বলল ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনোর সময়ও নাকি এখন।'

'নাদিয়া, তোমার ভুল হচ্ছে না তো? জেনেশুনে এরকম জিনিস ওরা বিক্রি করতে যাবে কেন?'

'ওরা নিজেরাও ডিমের কথা জানত না। কয়েকজন খদ্দের কমপ্লেন করেছে। তারপর ওরা পরীক্ষা করে দেখে ওই ক্যাকটাসগুলোর সবগুলোর কাণ্ডের ভেতরে ডিম পেড়ে রেখেছে বিষাক্ত ট্যারানটুলা মাকড়সা। ক্যাকটাসগুলো ওরা ধ্বংস করে ফেলেছে। শুধু আমাদের ঠিকানা জানত না বলে জানাতে পারেনি।'

শিউরে উঠল নাসিম। 'তা হলে কি...তা হলে কি...'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল নাদিয়া। 'আমারও ধারণা মিমির মৃত্যুর জন্য ক্যাকটাসটাই দায়ী। চলো, ডাক্তার সাহেবের হাসপাতালে যাই।'

স্কুটার নিয়ে ছুটল ওরা ধানমণ্ডি সাতাশ নম্বরে, জামশেদুর রহমানের পশু

নিরাময় ক্লিনিকে। ওদের দেখে ডাক্তার যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন. 'আরে, আমি এক্ষুণি আপনাদের বাসায় ফোন করতে যাচ্ছিলাম। কিমির বিপদ কেটে গেছে। মিমির অটোপসি করে বুদ্ধিমানের কাজ করেছি। নইলে হয়তো অসুস্থতার আসল কারণটা কোনদিন জানতে পারতাম না।'

'ডাক্তার সাহেব,' জিজ্ঞেস করল নাসিম, 'কিমি-মিমির ঠিক কী হয়েছিল বলুন তো?'

'এমন অদ্ভুত জিনিস জীবনে দেখিনি আমি। মিমি এবং কিমি কোনভাবে ট্যারানটুলা মাকড়সার কিছু ডিম খেয়ে ফেলেছিল। মিমির পেটে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে যায়। জানি না কথাটা বিশ্বাস করবেন কিনা।' জামশেদ চশমা খুলে চোখ ঘষতে লাগলেন। 'বাচ্চা মাকড়সাগুলো ওর নাড়িভুঁড়ি খেয়ে ফেলে।'

আঁতকে উঠল নাদিয়া এবং নাসিম।

'তবে কিমির ক্ষেত্রে সফল অপারেশনের মাধ্যমে আমরা ডিমগুলো বের করে আনি। ভাগ্যিস ওগুলো তখনও ফুটতে শুরু করেনি। আর কয়েক ঘণ্টা দেরি করলে কিমিওকে বাঁচানো সম্ভব হত না। মিমির মত দশা হত তারও।'

দ্রুত একবার দৃষ্টি বিনিময় করল নাদিয়া ও নাসিম। মুখ ছাই হয়ে গেছে দু'জনের।

'আচ্ছা, বেড়ালগুলোর পেটে ডিম এল কীভাবে কোন ধারণা দিতে পারেন?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার। 'এ ধরনের ট্যারানটুলা খুবই দুষ্প্রাপ্য। এরা ক্যাকটাসের গর্তে বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে বলেই শুনেছি।'

আবার শিউরে উঠল স্বামী-স্ত্রী। পরস্পরের দিকে তাকাল অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে। ট্যারানটুলার ডিম কোত্থেকে এসেছে ওরা এখন ভালই জানে। সেই সাথে এটাও জানে ওই বাসায় এই জনমে আর ঢুকতে পারবে না ওরা...

অশুভ প্রমোশন

মুখ অন্ধকার করে গাড়ি চালাচ্ছে রায়হান মুর্তজা। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে ও, এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে, কী যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যি, অবিশ্বাস্য ব্যাপারই বটে। রায়হান মুর্তজার মত একজন বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কিনা বিংশ শতাব্দীর এই শেষ লগ্নে নারায়ণগঞ্জের পাগলায় চলেছে এক তান্ত্রিক বুড়ির খোঁজে! রূপা যদি একবার জানত ব্যাপারটা তা হলে হেসেই খুন হয়ে যেত। রাগ করত কী? নাহ্, ওর মধ্যে রাগ বলে কিছু নেই। বরং সব শুনলে তক্ষুণি ফ্রিজ থেকে বেলের শরবত এনে বলত, 'নাও, এটা খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করো দেখি।' আর ওকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য

নিজেও বসে যেত আরেকটা গ্লাস নিয়ে।

উঁহু, এই খাওয়াটাই হয়েছে কাল। ভাল ভাল খাবার খেতে মুর্তজা নিজেও খুব পছন্দ করে। রূপাও তাকে নিত্য নতুন রান্না করে খাইয়ে সুখ পায়। রান্নার উপর বই আর পত্রিকায় ওদের ঘরের র‍্যাক বোঝাই। মুর্তজা নিজেই রূপাকে এসব বই কিনে দিয়েছে। আর রূপাও মহানন্দে একটার পর একটা এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে গেছে। মুর্তজাকে খাইয়েছে, ছেলেমেয়েদের খাইয়েছে, বন্ধু বান্ধবদের বিভিন্ন পার্টির ছুতো করে খাইয়েছে আর নিজে খেয়ে দিন দিন মুটকি হয়েছে। আর সর্বনাশ করেছে মুর্তজার।

দু'সপ্তাহ আগের ঘটনাটা ছবির মত ফুটে উঠল রায়হান মুর্তজার চোখে। সাকুরার বারে বসে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে মুর্তজা তার বন্ধু এবং সহকর্মী তমিজউদ্দিন রিজভিকে বলছিল, 'রিজভি সাহেব, অফিসে কয়েকদিন ধরে একটা কথা শুনছি, নাসির মোল্লার নাকি সামনের জানুয়ারিতে প্রমোশন হবে? ওর প্রমোশন হয় কী করে? ও তো আমার দু'মাস পরে চাকরিতে জয়েন করেছে।'

'ঠিকই শুনেছেন,' একটা কাজুবাদাম মুখে পুরে বলল রিজভি। 'সবাই তাই জানে।'

'কিন্তু ও প্রমোশন পাচ্ছে কীসের ভিত্তিতে?'

'নিন, আরেক পেগ হুইস্কি নিন,' হালকা গলায় বলল রিজভি। 'আর ব্যাপারটা মন থেকে মুছে ফেলুন।'

'না, আমি ব্যাপারটা মন থেকে মুছতে চাই না। আমি জানতে চাই নাসির মোল্লার চেয়ে জ্ঞানে-বুদ্ধিতে আমি কম কীসে? তার চেয়ে সিনিয়র হয়েও আমি কেন প্রমোশন পাব না?'

রিজভি আরেক পেগ হুইস্কি আনতে ইশারা করল ওয়েটারকে, তারপর বলল, 'সত্যি জানতে চান? মনে হয় না সত্যি কথাটা হজম করতে পারবেন।'

'রিজভি সাহেব, আমি সবসময় সৎ সমালোচনায় বিশ্বাসী। আমাকে বলুন আমার দোষটা কোথায়, তা হলে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি আর একটা কথাও বলব না।'

'মুর্তজা, দোষ আপনার নয়।'

'মানে?'

'প্রমোশন না হওয়ার জন্য আপনি দায়ী নন, মুর্তজা। দায়ী আপনার স্ত্রী।'

'আমার স্ত্রী।' খাবি খেলো রায়হান মুর্তজা। 'রূপা আবার কী করল?'

'কারণ তিনি স্থূলকায়া।'

'মানে মোটা?'

'জ্বী, মোটা,' গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রিজভি। মুখ না তুলেই বলল, 'কথাটা বলার জন্য আমি দুঃখিত, মুর্তজা সাহেব।'

'এমন অদ্ভুত কথা জীবনে শুনিনি। আমার স্ত্রী মোটা হোক বা চিকন হোক

তার সঙ্গে পদোন্নতির কী সম্পর্ক?'

'মুর্তজা সাহেব, আপনি চাকরিতে নতুন জয়েন করেছেন। তাই এখানকার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আপনি আমাদের গার্ডেন ক্লাবের সদস্য। কিন্তু এই ক্লাবের গোড়াপত্তনের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানেন কিছু?'

'আ…এটা কয়েকজন কোটিপতি মিলে প্রতিষ্ঠা করেছেন, এটা জানি। আমাদের এম.ডি. সালেহীন মির্জাও একজন ফাউন্ডার, তাই না?'

'হ্যাঁ। তবে এটা বোধহয় জানেন না যে গার্ডেন ক্লাবে প্রতি বছরের শেষে 'স্লিম কুইন অভ দ্য ইয়ার'-এর যে প্রতিযোগিতাটি হয়, তার বিজয়িনীর স্বামীকে পরের বছর বিশেষ প্রমোশন দেয়া হয়।'

'কি!' বিষম খেলো রায়হান মুর্তজা। খকখক কাশতে শুরু করল। ওর দিকে জলের গ্লাস এগিয়ে দিল রিজভি। হাসি চেপে বলল, 'নিন, পানি খান। বিষম কেটে যাবে।' ঢকঢক করে পুরো গ্লাস খালি করল মুর্তজা। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এ কেমন অদ্ভুত প্রমোশন। জীবনেও শুনিনি!'

'কোটিপতিদের খেয়াল!' মন্তব্য করল রিজভি। 'যারা এই ক্লাবের ফাউন্ডার তারা প্রত্যেকেই ব্যবসায়ী। গার্ডেন ক্লাব তাদের কোশ্চেন অভ প্রেস্টিজের ব্যাপার। ব্যবসায়ে তারা অদৃশ্য প্রতিযোগিতা করেন, বাইরের লোকে জানে না কে মার খেলো আর কে মার দিল। কিন্তু গার্ডেন ক্লাবের কথা পত্র পত্রিকার দৌলতে সবাই জানে। বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার চেয়ে 'স্লিম কুইন' প্রতিযোগিতা তাদের কাছে কম রোমাঞ্চকর নয়। মিস বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা বিটিভিতে না দেখালেও আমাদের গার্ডেন ক্লাবের কমপিটিশনের সচিত্র প্রতিবেদন দেখাতে বিটিভি ভুল করে না। দর্শক চাহিদা আছে বলেই দেখায়। তো, এই কমপিটিশনে অংশগ্রহণের যোগ্যতা রাখেন কেবল গার্ডেন ক্লাবের সদস্যরা। আর এই সদস্যরা, আপনি জানেন, বাইরের কেউ হতে পারে না, শুধু ফাউন্ডার ও কোম্পানির এমপ্লয়ার ছাড়া।' মুরগীর মুচমুচে ভাজা রানে কামড় বসাল রিজভি। মাংস চিবোতে চিবোতে বলে চলল, 'এখন ঘটনা হচ্ছে, যেহেতু এই কমপিটিশন কোশ্চেন অভ প্রেস্টিজের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই ক্লাবের প্রতিটি মালিক চান তাঁর কোম্পানিই এই সম্মানের অধিকারী হোক। কারণ এর ফলে মিডিয়া যে কাভারেজ দেয় সেটা বিজয়ী কোম্পানিকে আরও দশবছর সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিপুল সম্মানের অধিকারী হন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। জনসমক্ষে নিজেকে এক্সপোজ করার জন্যেই এই গার্ডেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা, এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কথাটা আমাদের মির্জা সাহেবকে বলতে যান, পরদিন এসে দেখবেন আপনার টেবিলে আরেকজন বসে আছেন।'

'কিন্তু যোগ্যতা, দক্ষতা এসবের কি কোনই দাম নেই এখানে?' ক্ষুব্ধ গলায় জানতে চাইল মুর্তজা।

'দাম থাকবে না কেন। অবশ্যই আছে। কিন্তু ওই যে বললাম কোটিপতিদের খেয়াল। নিজেদের কোম্পানির কোন এমপ্লয়ারের বউ বছরের সেরা "স্লিম কুইন"

হতে পারলে তাদেরই লাভ। সারা দেশের মানুষ তাদের চেহারা দেখতে পাচ্ছে, তারা গর্বের সাথে টিভিতে সাক্ষাৎকার দেন। "এ বছরের '''স্লিম কুইন''' মিসেস অমুকের সাফল্যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত।" তারপর বিজয়িনী মিসেস অমুক গদগদ গলায় বলেন, "আজকের এই প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হওয়ার সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল অমুক কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. তমুকের" ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'কিন্তু এটা তো ঠিক নয়, রিজভি সাহেব,' বলল মুর্তজা। 'শুধু স্লিম বলেই সে পুরস্কার পেয়ে গেল? আমার স্ত্রী রূপা তো দেখতে মন্দ নয়। বুদ্ধিমতী, হাসিখুশি, একজন আদর্শ মাতা–'

'দেখুন মুর্তজা সাহেব, তাতে কিছু যায় আসে না। গার্ডেন ক্লাবে স্লিমদেরই জয়জয়কার। আপনি আসলে নিজের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে চারদিকে নজর বোলাতে হয়তো ফুরসৎই পান না। গার্ডেন ক্লাবে প্রমোশনের জন্যে ভোট দেয়া হয়। তবে পুরুষ সদস্যকে অবশ্যই নয়, তার স্ত্রীকে। আর সেই স্ত্রী লোকটি যদি স্লিম না হন···।'

রিজভি ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছল।

'যা বলছিলাম,' আবার শুরু করল সে, 'আপনি বললেন আপনার স্ত্রী বুদ্ধিমতী। তার মানে তিনি বেশিরভাগ সময় পড়াশোনার পেছনে ব্যয় করেন। অথচ তখন অন্য মেয়েরা জিটিভি কিংবা স্টার প্লাসে হেলথ শো কিংবা ফ্যাশন শো দেখতে ব্যস্ত। আপনার স্ত্রী হাসিখুশি; কিন্তু অন্য মেয়েরা চটপটে। আপনার স্ত্রীকে একজন আদর্শ মাতা বলে দাবি করেছেন। অর্থাৎ তিনি সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে উপস্থিত হবার চেয়ে ঘরে থাকতেই বেশি ভালবাসেন। মুর্তজা সাহেব, এটা ১৯৯৬ সাল, একবিংশ শতাব্দীর আর মাত্র চার বছর বাকি। জেটসেটের এই যুগে আপনার মত এক্সিকিউটিভের স্ত্রীকে সুগৃহিণী হিসেবে অন্তত আমাদের সমাজে কেউ দেখতে চায় না। আপনাদেরকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।'

'কিন্তু রিজভি সাহেব···'

'যা হোক, আপনার স্ত্রী তাঁর তথাকথিত গুণাবলীর জন্যেই পিছিয়ে আছেন, এটা মানতেই হবে। তাঁকে পার্টিতে নিয়ে আসুন, অন্য মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। আপনার ঘরের কাজ করার জন্য তো চাকরবাকর আছেই। তা হলে কেন মিসেস রূপা এসবের পেছনে এত সময় ব্যয় করেন?'

'ও আসলে নিজের কাজ নিজেই করতে ভালবাসে।'

'আরে মুশকিলটা তো এখানেই। আপনার স্ত্রীর বোঝা উচিত তাঁর স্বামী একটি মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির টপ এক্সিকিউটিভদের একজন। তাঁকে কত পার্টিতে যেতে হয় আর এক্ষেত্রে স্বামীর সেরা অলঙ্কার হচ্ছেন তাঁর সুন্দরী স্ত্রী। আমার স্ত্রী সোনিয়ার কথাই ধরুন। সব পার্টিতে সে আমার সঙ্গে অ্যাটেন্ড করে। আর ফ্যাশন সচেতন বলে তার শরীরে একরত্তি মেদ নেই, সবসময় একটা ক্ষুধার্ত

দৃষ্টি চোখে। যেটা আমাদের বস্ খুবই পছন্দ করেন।

'তা হলে উনি ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করেন না কেন?' সরল মুখ করে জানতে চাইল রায়হান মুর্তজা।

'হ্যাঁ, বেশি বেশি খাক আর মুটকি হোক–'

'বেশি খেলে মানুষ মোটা হয় ঠিকই। কিন্তু চেহারায় হাসিখুশি ভাবটাও থাকে। রূপা তেমনই একটি মেয়ে। সবসময় আনন্দ ফুর্তিতে থাকে। আমার এবং বাচ্চাদের যত্নআত্তির প্রতি তার কড়া নজর।'

'দেখুন, মুর্তজা সাহেব, হাসিখুশি থাকা ভাল কিন্তু মোটা হওয়া খুবই বিশ্রী।'

'আপনি ভুল বলছেন।'

'না, আমি ঠিক কথাই বলছি। ফ্যাশনের ওপর বই পত্রিকা ঘাঁটুন, মহিলাদের ম্যাগাজিন পড়ুন, বিদেশী টিভি অ্যাডগুলো দেখুন। সব ফ্যাশন সচেতন, মডেল কন্যাদের দেখে মনে হবে যেন তারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত কোন রিফিউজি ক্যাম্প থেকে এসেছে। কিন্তু এই স্লিম মেয়েদেরই এখন গোটা দুনিয়া জুড়ে রাজত্ব।'

'কিন্তু এমন নিয়ম কে তৈরি করেছে?'

'কে করেছে সেটা মুখ্য ব্যাপার নয়। সব বুদ্ধিমতী মেয়েই এখন স্লিম ফিগারের অধিকারিণী হতে চায়, আর আপনার স্ত্রী যদি এদের সঙ্গে তাল মেলাতে না পারেন তা হলে আপনারই ক্ষতি।'

'কিন্তু আমি মানতে পারলাম না।'

'সে আপনার ব্যাপার। কিন্তু আপনার স্ত্রী যদি ক্রমশ মোটা হতেই থাকেন তা হলে আপনার প্রমোশনও ক্রমশ পেছোতে থাকবে।'

'মনে হয় আপনি যেন রায় দিয়ে ফেললেন।'

'আমি রায় দেয়ার কে? আপনাকে তো বলেইছি আমার স্ত্রী বেশ কিছুদিন ধরে স্লিম হতে শুরু করেছে। আর সেই সঙ্গে আমার সৌভাগ্যের ডালপালাও মেলে যাচ্ছে। আর তাই আগামী জানুয়ারিতে আপনি সম্ভবত আমাকে সেলস ডিপার্টমেন্টের প্রধানের চেয়ারে উপবিষ্ট দেখতে পাবেন।'

'রিজভি সাহেব!' বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুর্তজার।

'জ্বী, মুর্তজা সাহেব।' কেতা দুরস্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রিজভি। 'নাসির মোল্লা প্রমোশন পাবে না, পাব আমি। এটা একেবারে ভেতরের খবর। চোখদুটো এবার মেলুন, মুর্তজা। আর কত জেগে ঘুমাবেন। বুদ্ধি, সুরুচি, আদর্শ স্ত্রী কিংবা মাতা হওয়ার সমস্ত ঘাটতিই পূরণ করা সম্ভব–শুধু স্লিম ফিগারের অধিকারী হলেই। কিন্তু চর্বির তাল হলে। ওহ্, এ এক কথায় অসম্ভব।'

হাতে হাত ঘষল মুর্তজা। 'আমাকে তা হলে কী করতে বলেন?'

'আপনার স্ত্রীকে কঠিন ডায়েটে অভ্যস্ত করান। নয়তো আপনার প্রমোশন পাওয়া কঠিন হয়ে উঠবে।'

'কিন্তু রিজভি, ও তো তেমন মোটা নয়। বরং স্বাস্থ্যবতী বলা চলে। ওর এই ফিগারটাই আমার পছন্দ।'

'কিন্তু আর পছন্দ হলে চলবে না। নিজের উন্নতি চান তো এখনই কাজ শুরু করে দিন। আজ রাত থেকেই ডায়েট কন্ট্রোলের রুটিন করে ফেলুন।' ঘড়ি দেখল রিজভি। 'আজ আমার একটু তাড়া আছে। চলি।'

সেদিন সন্ধ্যায় তমিজউদ্দিন রিজভির সৌভাগ্যে ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি ফিরল রায়হান মুর্তজা। রূপাকে দেখল বাড়ির লনে দুই বাচ্চাকে নিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলায় ব্যস্ত। জুনের শেষ। বাচ্চারা তাদের হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার ঝামেলা থেকে মুক্ত। বাবাকে দেখে রলি-পলি, জমজ দুই ভাই-বোন, দৌড়ে এল।

'বাবা, জানো, মাকে না আমরা দুই গেমে হারিয়ে দিয়েছি,' মুর্তজার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল রলি।

মুর্তজা অদূরে দাঁড়ানো রূপার দিকে তাকাল। প্রতিমার মত একখানা মুখ, হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে আজ আর হাসল না মুর্তজা। কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল স্ত্রীর দিকে। মনে মনে বলল, 'যে হারে মুটকি হচ্ছে দিন দিন, আর ক'দিন পরে খেলা দূরে থাক, নড়তে পারবে কিনা সন্দেহ।'

মিষ্টি হাসিটা মুখ থেকে মুছে গেল রূপার। দ্রুত এগিয়ে এল সে, উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে মুর্তজা? মুখখানা এত শুকনো লাগছে কেন? শরীর খারাপ করেনি তো!' কপালে হাত রাখল সে।

হাতটা সরিয়ে দিল মুর্তজা। শুকনো গলায় বলল, 'না, ঠিক আছি আমি।'

'তা হলে মুখ ধুয়ে এসো। তোমার জন্য ফুলকপির বড়া ভেজে রেখেছি। এখনও গরম আছে। এক সঙ্গে খাব বলে ওভেন থেকে নামাইনি।'

ওহ, আবার সেই খাওয়া!

'আচ্ছা, রূপা,' তেতো গলায় বলল মুর্তজা। 'সব সময় এত খাইখাই করো কেন বলো তো?'

কে যেন একরাশ কালি ছিটিয়ে দিল রূপার সুন্দর মুখখানায়। ম্লান গলায় বলল, 'এভাবে কথা বলছ কেন, মুর্তজা?'

মনটাই খারাপ হয়ে গেল মুর্তজার। রূপার কালো মুখ সে একদম সহ্য করতে পারে না। তাড়াতাড়ি বলল, 'না, মানে, বলছিলাম কী এত খাওয়া দাওয়া করা আসলে ঠিক নয়। বিশেষ করে তেলেভাজা। জানোই তো ওগুলোতে সবচেয়ে বেশি কোলেস্টেরল।'

'জানি,' আবার হাসি ফিরেছে রূপার মুখে। 'কিন্তু সাহেব, আপনি তেলেভাজা ভালবাসেন বলেই তো ওগুলো তৈরি করা হয়।'

'তা বাসি।' স্বীকার করল মুর্তজা। তারপর সাবধানে বলল, 'কিন্তু তোমার কি এত তেলেভাজা খাওয়া ঠিক হচ্ছে? মুটিয়ে যাচ্ছ তো!'

'আমি মুটিয়ে যাচ্ছি!' হাসিটা ঠোঁটে ধরে রেখে জবাব দিল রূপা। আঙুল দিয়ে ইশারা করল মুর্তজার ভুঁড়ির দিকে। 'আর ওখানটায় কী গজিয়েছ দেখেছ?'

'কিন্তু আমি এটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই ধরি না,' বলল মুর্তজা।

'আমিও না,' বলল রূপা। 'আমি মোটা হলে লোকের কী। তোমার চোখে সুন্দরী থাকলেই হলো। যাকগে, তোমার জন্যে স্ট্রবেরী আইসক্রীম বানিয়েছি। ওটা কখন খাবে? এখন না রাতে?'

'না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুর্তজা। 'এখনই নিয়ে এসো,' আইসক্রীমের কথা শুনেই তার জিভে জল এসে গেছে।

'ঠিক আছে। তোমার জন্যে আজ ইলিশ পোলাও রেঁধেছি।' মুর্তজার হাত ধরে ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল রূপা। 'বেশ বড় গলদা চিংড়ি পেয়েছি নিউমার্কেটে। তুমি তো আবার চিংড়ি মালাইকারী খুব পছন্দ করো। ওটাও রেডি করে রেখেছি।'

এই হলো রূপা। তার প্রিয় জিনিসগুলো রান্না করার আনন্দে সবসময় মশগুল। এই মেয়েকে সে কী করে ডায়েট কন্ট্রোলের কথা বলবে। রূপাকে কড়াভাবে কথা বলার ক্ষমতা নেই মুর্তজার। স্ত্রীকে প্রচণ্ড ভালবাসে সে। কোন কারণে রূপার মন খারাপ থাকলে ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায় তার। এমন প্রেমময়ী স্ত্রী পেয়ে সে সুখী, খুব সুখী। হোক রূপা মোটা। কিন্তু এত ভাল, এত স্বচ্ছ মনের মেয়ে বাংলাদেশে আর ক'টা আছে? অন্য লোকদের স্ত্রীরা তার বউকে যা খুশি ভাবুক, তার প্রমোশন হোক বা না হোক, কেয়ার করে না মুর্তজা। সর্বগুণে গুণান্বিতা একটি মায়াবতী মেয়ের স্বামী হিসাবে সে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে, ব্যস। অন্যদের আলোচনা সমালোচনাকে গুল্লি মারো।

কিন্তু বললেই তো আর গুল্লি মারা যায় না। ঈর্ষার কাঁটাটা বুকে যে বড় খচখচ করে। তমিজউদ্দিন রিজভির বউ সোনিয়াকে সে দেখেছে। মাস ছয় আগে কোম্পানির খরচে সবাই শফিপুরে পিকনিকে গিয়েছিল। তখন সোনিয়ার সঙ্গে পরিচয় মুর্তজার। কণ্ঠার হাড় বের করা, তোবড়ানো গালের সোনিয়াকে মোটেও সুন্দরী মনে হয়নি মুর্তজার। অথচ তার পাশে লাবণ্যে ঢলঢল রূপাকে সাক্ষাৎ প্রতিমার মত লাগছিল। কিন্তু ওই হাড়গিলে চেহারার সোনিয়াই নাকি এবার 'স্লিম কুইন অভ দ্য ইয়ার' বলে ঘোষিত হবে। পত্রপত্রিকায় কাভারেজই শুধু নয়, নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকাও পাবে রিজভি দম্পতি। অবশ্য এটা ব্লাফও হতে পারে। রিজভি মুর্তজার মনে ইচ্ছে করে ঈর্ষার কাঁটা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু ব্যাপারটা যে ব্লাফ নয়, কয়েকদিনের মধ্যে টের পেয়ে গেল মুর্তজা। এ বছর প্রতিযোগীর সংখ্যা বেশ কম। গার্ডেন ক্লাবের একটা নিয়ম আছে, যারা একবার বিজয়িনী হয় তারা পরবর্তীতে আর কোন প্রতিগোগিতায় অংশ নিতে পারে না। তা ছাড়া বস্ সালেহীন মির্জার বেশ পেয়ারের পাত্র তজিমউদ্দিন রিজভি। ইদানীং রিজভি দম্পতির সঙ্গে মির্জা সাহেবকে শেরাটন, সোনার গাঁয়ের লাউঞ্জে দেখেছে কেউ কেউ। মুর্তজার সন্দেহ, স্বার্থ হাসিলের জন্য রিজভি হয়তো তার বউয়ের সঙ্গে সাহেবকে হালকা ফষ্টিনষ্টি করার সুযোগও করে দেয়। আর সালেহীন সাহেবের লুচ্চা হিসাবে একটা বদনাম আছে। গার্ডেন ক্লাবের সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষ তিনি। তাই তাঁর অনুগ্রহ, একটু অনুকম্পার আশায় থাকে

অনেকেই। মুর্তজা আগে জানত না এসব কথা। এখন খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে শুরু করেছে। বসের বিশেষ অনুগ্রহ পেতে বউকে তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার সুযোগ দিতে আগ্রহী নয় মুর্তজা। তবে এই হাতে হালকা ছোঁয়া, অতর্কিতে শরীরে শরীর লেগে যাওয়া–এটুকু ছাড় দিতে রাজি আছে সে। কিন্তু সেই সুযোগটুকুই বা পাচ্ছে কোথায় মুর্তজা? বউ স্লিম না হলে সালেহীন সাহেব তো ফিরেও তাকাবেন না। ইস্, মরতে কেন যে সে এই মুটকিটাকে বিয়ে করেছিল!

সেদিন অফিস ছুটির পরে মনমরা হয়ে সাকুরায় চুপচাপ একা কোনার একটা টেবিল দখল করে বসে আছে মুর্তজা, চমক ভাঙল ওয়েটারের ডাকে। 'সার, আজ কী খাবেন?'

চোখ তুলে চাইল মুর্তজা। জাফর। তরুণ এই ওয়েটারটিকে সে বিশেষ পছন্দ করে। সাকুরায় তার জন্যে এই টেবিলটা সব সময় খালি রাখে জাফর। মুর্তজা বলল, 'দাও তোমার যা খুশি।'

দ্রুত একটা ব্লাক ডগের বোতল নিয়ে এল জাফর। সঙ্গে কাটলেট। দক্ষতার সঙ্গে গ্লাসে মদ ঢেলে ওটা এগিয়ে দিল মুর্তজার দিকে। ঢকঢক করে তরল পদার্থটা গিলে ফেলল মুর্তজা। খালি গ্লাস আবার পূর্ণ করল জাফর। এভাবে পরপর ছয় পেগ হুইস্কি খেয়ে ফেলল মুর্তজা। একসঙ্গে এত মদ সাধারণত খায় না সে। কিন্তু আজ পুরো এক বোতল শেষ করল। রিজভির প্রতি ঈর্ষার আগুনটাকে সে নিভিয়ে ফেলতে চাইল তরল আগুন দিয়ে। কিন্তু লাভ হলো না কোন। বুকের জ্বালাটা দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

রায়হান মুর্তজার লাল টকটকে চেহারা দেখে ভয় পেল জাফর। অনুনয় করে বলল, 'আর খাবেন না, সার। বিপদ হবে।'

'আর বিপদ! যে বিপদে আমি আছি তার চেয়ে আর বড় বিপদ হতে পারে না, জাফরুল্লাহ,' জড়ানো গলায় বলল মুর্তজা।

জাফর চট করে একবার চারপাশে চাইল। মাত্র সন্ধ্যা বলে লোকজন এখনও তেমন আসতে শুরু করেনি। সে ঝুঁকে এল মুর্তজার দিকে। ফিসফিস করে বলল, 'সার, কি খুব সমস্যায় আছেন?'

লাল চোখ মেলে ওর দিকে তাকাল মুর্তজা। বলল, 'তুমি সমাধান দিতে পারবে?'

হাত কচলে জাফর বলল, 'আপনারা সার বড় লোক। আমি চুনোপুঁটি মানুষ। কিন্তু সার ইঁদুর আর সিংহের গল্পটা তো জানেন। ওই যে একবার একটা সিংহ জালে আটকা পড়ে–'

'ব্যস, ব্যস,' হাত তুলল মুর্তজা। 'ও গল্প আমি জানি। কিন্তু তুমি গার্ডেন ক্লাবের কথা জানো?'

নেশার ঘোরে সমস্ত ঘটনা এবার জাফরকে বলল মুর্তজা। চুপচাপ শুনে গেল জাফর। শুধু মাঝে মধ্যে মাথা নাড়ল। তারপর সহানুভূতিশীল গলায় বলল, 'তা হলে সব কিছুর কারণ হচ্ছে আপনার স্ত্রী একটু মোটা?'

'কারণ ও খেতে ভালবাসে,' বলল মুর্তজা। 'তবে খেয়েও যদি ও মোটা না হত তা হলে কোন সমস্যাই থাকত না। কিন্তু এ কাজ শুধু ম্যাজিশিয়ানদের পক্ষেই সম্ভব।'

'তাই?' ভ্রু কোঁচকাল জাফর। 'তা হলে মনে হয় আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারব।'

'তুমি? সত্যি?' ঘোর কাটতে শুরু করেছে মুর্তজার। হাসল সে। 'ওয়েটাররা নিজেদের অনেক কাজের কাজি বলে মনে করে জানি। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই নিজেকে মেডিকেলের ডাক্তার বলে দাবি করছ না?'

'না। সে দাবি আমি করছি না। কিন্তু আমার নানী একজন ডাক্তার। লতাপাতা দিয়ে মানুষের চিকিৎসা করেন। তন্ত্রসাধক। তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

'আমি তন্ত্রফন্ত্রে বিশ্বাস করি না।'

'আপনার বিশ্বাস না করলেও চলবে। কিন্তু তন্ত্রমন্ত্রে ঠিকই কাজ হয়।'

অবশিষ্ট কাটলেটটা মুখে পুরল মুর্তজা। এসব আলতু ফালতু আলাপ করে লাভ নেই, ভাবল সে। এ তাকে মানায় না। কিন্তু ব্যাপারটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করতেও মন চাইল না।

'তুমি বলছ তোমার নানী একজন তন্ত্রসাধক?' জিজ্ঞেস করল মুর্তজা। 'শুনি তো উনি কী ধরনের তন্ত্র সাধনা করেন।'

'নারায়ণগঞ্জের পাগলার রায়নিধি গ্রামে থাকেন আমার নানী। সবাই তাঁকে ওখানে জটা বুড়ি নামে চেনে। ভেষজ চিকিৎসা করেন। খুবই ভাল চিকিৎসক। গতবার আমার পেটে সমস্যা হলো। কোন ডাক্তার ধরতে পারে না কী হয়েছে। নানীর কাছে গেলাম। নানী বললেন আমার লিভার বড় হয়ে গেছে। তিনি কিছু বড়ি খেতে দিলেন। খেয়ে ভাল হয়ে গেলাম।'

'কিন্তু এর সঙ্গে তন্ত্র মন্ত্রের কী সম্পর্ক?'

'নানী যাকেই যা দেন, মন্ত্র পড়ে দেন। আর তাতেই সবাই ভাল হয়ে যায়,' বলল জাফর।

'ওঁনার সঙ্গে দেখা করা যাবে?' জানতে চাইল মুর্তজা। কৌতূহল হচ্ছে ওর। অন্তত একবার বুড়ির সঙ্গে কথা বলতে দোষ কী।

'আপনি যাবেন ওখানে? কবে যাবেন বলুন? আমি নানীকে জানিয়ে রাখব।'

'তুমি যত তাড়াতাড়ি তাঁকে জানাতে পারবে।'

তারপর আজ রায়হান মুর্তজা যাত্রা শুরু করেছে পাগলার রায়নিধি গ্রামের উদ্দেশে। জাফর খুব ভালভাবে পথ বলে দিয়েছে, ম্যাপ এঁকে দেখিয়েও দিয়েছে তার নানীর বাড়ির অবস্থান। তাই প্রত্যন্ত গ্রাম হলেও বাড়ি চিনতে কোনই অসুবিধে হলো না মুর্তজার।

ভেবেছিল জটাজুটিতে বোঝাই এক কুৎসিত বুড়িকে দেখবে। কিন্তু বুড়ি বইয়ে

পড়া তন্ত্র সাধকদের মত মোটেই নয়। সত্তরের কোঠায় বয়স, এক মাথা সাদা চুল, কালো মিশমিশে মহিলা তার ঝকঝকে মাটির কুটিরের মতই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মুর্তজার পরিচয় পেয়ে হাসল বুড়ি। ঝিকিয়ে উঠল মজবুত এক সারি সুবিন্যস্ত দাঁত। বলল, 'ভেতরে আসুন। জাফর আপনার কথা আমাকে বলেছে।'

গ্রাম্য এক মহিলার মুখে শুদ্ধ ভাষা শুনবে কল্পনাও করেনি মুর্তজা। কুটিরে ঢুকল সে। বুড়ি একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।

'আপনার স্ত্রীকে কম খেতে বলুন,' শুরুতেই কাজের কথায় চলে এল সে।

'কিন্তু এই জিনিসটাই তো আমি ওকে বলতে পারব না!'

'যারা খেতে ভালবাসে তাদের পক্ষে হঠাৎ খাওয়া কমিয়ে দেয়া বেশ কঠিন কাজ। তবে একহারা হওয়ার এটা অন্যতম উপায়।'

'একমাত্র উপায় নিশ্চয়ই নয়।'

'তা নয়। এর জন্য অন্য ব্যবস্থাও রয়েছে।'

'যেমন তন্ত্র-মন্ত্র, তাই না?' হাসল মুর্তজা।

'এখানে আসার পথে,' শান্ত গলায় বলল জটাবুড়ি, 'কোন বাড়ির খড়ের গাদায়, ধান খেতে বিশেষ কিছু চিহ্ন চোখে পড়েনি?'

'হ্যাঁ, পড়েছে।' মাথা দোলাল মুর্তজা। 'রঙ বেরঙের কিছু ফেস্টুন দেখলাম।'

'ওগুলো সব মন্ত্র পড়া ফেস্টুন,' বলল মহিলা। 'খড়ের গাদা সাজাবার জন্যে কিংবা খেতের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য লোকে ওসব রাখেনি। রেখেছে মন্দ আত্মাকে তাড়াতে, যারা ফসল ধ্বংস করে। এই ব্যাপারগুলো কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেয়ার আগে একটা কথা মনে রাখবেন সাহেব, এই রায়নিধি গ্রামের কৃষকরা তথাকথিত শহুরে সভ্যতা থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। এখানে বিদ্যুৎ নেই, আধুনিক সেচ ব্যবস্থার অভাব, ট্রাক্টর চলে না। ওরা মন্দ আত্মা, ভাল আত্মায় বিশ্বাসী। তারপরও ঢাকা শহরে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে টাটকা শাকসব্জি এবং সরু বালাম চালের যোগানদার কিন্তু এরাই। শহুরে সুযোগ সুবিধা ভোগকারী কৃষকদের চেয়ে এরা ভাল আছে।'

'আমি দুঃখিত,' বলল মুর্তজা। 'আমি আপনাদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দিতে চাইনি। আসলে আজকের দিনে তন্ত্র-মন্ত্র কেউ বিশ্বাস করে না বলেই জানতাম। এখানে না এলে জানতেই পারতাম না ভূত-প্রেতের ব্যাপারে এখনও কেউ কেউ এত গভীরভাবে বিশ্বাস করে।'

'হাজার বছর ধরে মানুষ তার অনেক অজানা প্রশ্নের জবাব পেয়েছে ডাকিনীবিদ্যার কাছে। পুরানো হলেও এটি একটি সম্মানজনক ঐতিহ্য। চিকিৎসাশাস্ত্র কিংবা চাষ-বাসের চেয়ে তন্ত্র সাধনা, ডাকিনীবিদ্যা অনেক প্রাচীন একটি বিষয়।'

'কিন্তু এই বিদ্যা আমার কতটুকু কাজে আসতে পারে?' জিজ্ঞেস করল মুর্তজা।

'ব্যাপারটা নির্ভর করবে নিজের চাওয়ার প্রতি আপনি কতটা আন্তরিক।'

'পৃথিবীর যে কোন ব্যাপারের চেয়ে আন্তরিক।'

জটাবুড়ি চিবুকে হাত রেখে চিন্তিত গলায় বলল, 'সাধারণত আমি মন্ত্র চালনা করি শুধু তখন যখন আর সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। একেবারে চরম সময়ে, বুঝতেই পারছেন। কোন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমি কাজ করি না। কিন্তু আপনাকে খুব মরিয়া দেখাচ্ছে। তো এ ব্যাপারে আপনাকে প্রাথমিক কিছু সাহায্য আমি করতে পারব বলে মনে হয়। প্রথমেই মনে রাখবেন এই কাজটা আমরা করব শরীর নিয়ে। আত্মার কোন ভূমিকা আমি এরমধ্যে শুরুতেই রাখতে চাই না। শরীরের ওজন হারানো মানে মেদ কমে যাওয়া। শক্তির কোন ধ্বংস নেই, সাধারণ ডায়েটে অতিরিক্ত মেদ শক্তিতেই রূপান্তরিত হয়। এমনকী তন্ত্র সাধনাতেও শরীরের এই চিরন্তন সত্যটিকে অনুসরণ করা হয়। যতক্ষণ এই মেদ শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব না হচ্ছে, ততক্ষণ এটাকে অন্য কারও শরীরে স্থানান্তর করতে হবে। অর্থাৎ আপনার স্ত্রী যখন ওজন হারাতে শুরু করবেন তখন আরেকজনের শরীরে মেদের আধিক্য দেখা দেবে।'

'কিন্তু সেইজন কে?'

'আপনি যার কথা বলবেন।'

'কিন্তু কীভাবে এটা ঘটবে?'

'সেটা আপনার জানার দরকার নেই। এখন এই দু'জনের ছবি এবং নাম আমার দরকার।'

'বাণ মারার কথা শুনেছি। আপনি কি সেরকম কিছু করবেন?'

'বললামই তো, ও ব্যাপারে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে।'

মুর্তজার মাথায় হঠাৎ বুদ্ধিটা খেলে গেল। শয়তানী হাসি ফুটল ঠোঁটে। সে যা ভেবেছে ঘটনা তেমন ঘটলে দারুণ হবে। পকেট থেকে দ্রুত ওয়ালেট বের করল মুর্তজা, একটা ছবি দিল জটা বুড়িকে। ছবিটা রিজভি শফিপুর পিকনিক স্পটে তুলেছিল। তার স্ত্রী রূপা, সে আর রিজভির বউ সোনিয়া হাসিমুখে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে।

'ডানদিকের মোটাসোটা মহিলাটি আমার বউ, রূপা। মাঝখানের শুটকি চেহারার মেয়েটার নাম সোনিয়া রিজভি। আমার স্ত্রীর শরীরের ওজন এই মেয়েটার গায়ে চাপিয়ে দেয়া যাবে?'

'এটা কোন ব্যাপারই নয়।' হাসল জটাবুড়ি। 'আমরা কবে থেকে শুরু করব?'

'আপনি পারবেন তো কাজটা করতে?'

'পারব। কিন্তু সময় লাগবে। এই মাস খানেক। চলবে?'

'খুব চলবে।'

'তবে কাজটা শুরুর আগে আপনাকে একটা ব্যাপার বলে রাখা ভাল। এই কাজে ডাক্তারী চিকিৎসার মতই কোন জটিলতা দেখা দিতে পারে। আর সেটা খুব সাংঘাতিক কিছু হতে পারে।'

রিজভির ফোলা মুখ থেকে সার্বক্ষণিক দেঁতো হাসিটা মুছে ফেলতে মুর্তজা

বদ্ধ পরিকর। সে বলল, 'নানী, আপনি সর্বশক্তি দিয়ে চালিয়ে যান। জানেন না আপনি আমার কী উপকার করতে যাচ্ছেন।'

মৃদু হাসল বুড়ি। 'আমার কাজ দেখে আপনি সন্তুষ্টই হবেন। আর কোন প্রয়োজন হলে আমার নাতি জাফরকে বলবেন। ও আমাকে খবর পৌঁছে দেবে।'

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ওয়ালেটটা আবার খুলল মুর্তজা। বলল, 'নানী, আপনাকে কত দিতে হবে?'

'না, না, এখনই কিছু দিতে হবে না,' দ্রুত বলল বুড়ি। 'শহুরে লোকজনের সঙ্গে এর আগে আমি কাজ করিনি। গ্রামের মানুষ আমার কাজে সন্তুষ্ট হলে চাল, ডাল, তরিতরকারি, ডিম, দুধ ইত্যাদি দিয়ে যায়। তা দিয়েই আমার দিব্যি পেট চলে। যা হোক, আগে কাজ হোক। তারপর খুশি হয়ে যা দেবেন নেব।'

'দরকার হলে আমার জীবনটা আপনাকে দিয়ে দেব।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল রায়হান মুর্তজা। 'আমি আপনার সঙ্গে শিগ্গিরই আবার দেখা করব।' হাসতে হাসতেই এগোল সে শ'গজ দূরে পার্ক করা গাড়ির দিকে। এই মুহূর্তে তার চেয়ে সুখী মানুষ আর কেউ নেই।

কিন্তু এক মাস কেটে যাবার পরেও কিছু ঘটল না দেখে নিজেকে অভিশাপ দিল মুর্তজা বেহুদা সময় নষ্ট করেছে বলে। তন্ত্র সাধনা! ডাকিনীবিদ্যা! ফুঃ, একমাত্র নির্বোধরাই এসবে বিশ্বাস করে। রাগের চোখে মুর্তজা সাকুরায় যাওয়াই বন্ধ করে দিল। জাফরকে দেখলেই এখন তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়।

শনিবার, রাত সাড়ে আটটায় মুর্তজা স্টার প্লাসে 'বে-ওয়াচ' দেখছে আর অর্ধনগ্ন সুন্দরীদের মাথা খারাপ করা ফিগার দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, এই সময় রূপা এসে দাঁড়াল ওর পাশে।

'ডার্লিং,' বলল সে। 'একটা সমস্যা হয়েছে, জানো। আমার মনে হয় আমি ওজন হারাতে শুরু করেছি।'

শুয়ে ছিল, তিড়িং করে উঠে বসল মুর্তজা। রূপাকে জাপটে ধরে বলল, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ। আজ গাউছিয়ায় যাবার জন্যে নীল টাঙাইল শাড়িটা আর কালো ব্লাউজটা বের করেছি। দেখি ব্লাউজটা ঢিলে লাগছে শরীরে।'

'শুনে সত্যি ভাল লাগছে, ডার্লিং।' রূপাকে টপ করে চুমু খেলো মুর্তজা।

রূপা চিন্তিত গলায় বলল, 'কিন্তু ওজন কমার মত তো কারণ ঘটেনি। আমি তো ডায়েট কন্ট্রোল করি না।'

'অবশ্যই করো না। ও তোমাকে করতেও হবে না। এই ব্যাপারটা নিয়ে আর চিন্তা কোরো না তো।'

'কিন্তু চিন্তা এসে যায়। আমার মনে হচ্ছে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব।'

'ধ্যাত। ওজন কমলেই বুঝি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে?'

'না, তুমি জানো না। মা বলতেন মোটাসোটা মানষরাই বেশি সুখে থাকে।

অসুখ বিসুখ কম হয়।'

'তোমার মা গ্রামের মানুষ ছিলেন। তাঁরা নানা রকম কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন। আমার কথা শোনো। টেক ইট ইজি। সব ঠিক হয়ে যাবে।' দু'হাতের চেটোয় রূপার গাল চেপে ধরল মুর্তজা। গম্ভীর গলায় বলল, 'আই লাভ ইউ।'

'কিন্তু আমার সত্যি চিন্তা লাগছে, মুর্তজা।'

'আর চিন্তা করতে হবে না। বগুড়ার দই আছে না ফ্রিজে? নিয়ে এসো তো দু'বাটি। চিন্তা ফিন্তা সব দই দিয়ে গুলে খাই।'

অফিসে রায়হান মুর্তজা এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত একজন মানুষ। কোন হতাশা নেই, নেই কারণে অকারণে অধীনস্থদের গালি গালাজ। আবার সে পরিণত হয়েছে সর্বদা আমোদপ্রিয় একজন মানুষে।

মুখ কালো করে তমিজউদ্দিন রিজভি যেদিন তাকে বলল তার বউ সোনিয়া কী এক অজ্ঞাত কারণে ইদানীং ফুলতে শুরু করেছে, হাসিতে পেট ফেটে যাবার দাখিল হলো মুর্তজার। কিন্তু অনেক কষ্টে গম্ভীর থাকল সে। সোনিয়াকে ভাল ডাক্তার দেখাতে পরামর্শ দিল। তারপর বাথরুমে গিয়ে প্রথমেই এক চোট হেসে নিল।

প্রতিদিন দশটা-পাঁচটা সারা অফিস রায়হান মুর্তজা মাতিয়ে রাখলেও বাসায় ফিরে সে গম্ভীর হয়ে যায়। কারণ রূপা। রূপা যত শুকাতে শুরু করেছে ততই খিটখিটে হয়ে উঠছে মেজাজ। সবসময় কী এক নার্ভাসনেসে ভোগে, একটুতেই রেগে গিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। বাচ্চারা পর্যন্ত এখন মার কাছে যেতে সাহস পায় না। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছে মুর্তজা। প্রচুর ওষুধ খেয়েছে রূপা। কিন্তু দিন দিন অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। কোটরাগত চোখ, ভাঙা গাল দেখে কে বলবে এই মেয়ে হাসলে এক সময় পৃথিবী হেসে উঠত। সুস্বাদু খাবার যার খুব প্রিয় ছিল সে এখন কিছুই খেতে চায় না। রান্নাঘর ছিল যার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা এখন সে ওদিকে ভুলেও পা মাড়ায় না। তার এখন দিন কাটে মুর্তজা আর বাচ্চাদের সঙ্গে অসম্ভব দুর্ব্যবহার করে।

হঠাৎ একদিন পার্টি বিমুখ রূপা ঘোষণা করল সে মুর্তজার মত গার্ডেন ক্লাবের সদস্য হবে, আর চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি থাকতে রাজি নয়। বাচ্চাদের জন্য কাজের বুয়া রাখল সে। তারপর থেকে বিভিন্ন পার্টিতে যোগ দিতে শুরু করল রূপা।

কিন্তু এসব পার্টিতে তমিজউদ্দিন রিজভি কিংবা সোনিয়া কাউকেই দেখা গেল না। সোনিয়ার অবস্থা দেখতে মুর্তজা একদিন তাদের বাসায় গিয়েছিল। সোনিয়াকে দেখে আঁতকে উঠেছে সে। ছোটখাট একটি হাতিতে পরিণত হয়েছে এক সময়ের 'স্লিম কুইন হতে যাওয়া' সোনিয়া। আগের কোন পোশাকই এখন তার গায়ে লাগে না।

সোনিয়ার চেয়েও খারাপ অবস্থা তমিজউদ্দিন রিজভির। কিছুদিন আগে

মুর্তজা যে রকম ছিল তারই জেরক্স কপি যেন এখনকার রিজভি। সবসময় খিটখিটে মেজাজ, কারও সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না, মুর্তজার সঙ্গে কাজের খাতিরে দেখা হয় রোজই। কিন্তু ভদ্রতা করে 'হ্যালো' বলতেও সে যেন আজকাল ভুলে গেছে। তার ঝড়ো কাকের মত চেহারা দেখে মনে মনে হাসে মুর্তজা। আর আনন্দে বগল বাজায়।

কিন্তু এই আনন্দ বাসায় ফিরলেই চরম নিরানন্দে পরিণত হয়। রূপাকে সে প্রায়ই বাড়িতে পায় না। রূপা বাসায় ফিরেই কোন না কোন ছুতোয় ঝগড়া বাধিয়ে দেয় মুর্তজার সঙ্গে। মুর্তজা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখে। রূপার দিকে তাকিয়ে সেদিন সে ভয়ানক চমকে উঠল। একি দশা হয়েছে মেয়েটার! শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গেছে। এভাবে শুকাতে থাকলে তো বেশিদিন বাঁচবে না। জটা বুড়ির কথা এতদিনে ভুলেই গিয়েছিল মুর্তজা। খুব শিগ্গির বুড়ির সঙ্গে দেখা করার তাগাদা অনুভব করল সে। সমস্যাটা কোথায় জানতে হবে তাকে।

শুক্রবার বিকেলে মুর্তজাকে অবাক করে দিয়ে ওর বাসায় এসে হাজির হলো রিজভি। বিদায় জানাতে এসেছে।

'বিদায়?' একটা সিগারেট ধরাল মুর্তজা। 'কীসের জন্যে?'

'আমি এই ইঁদুর দৌড়ে আর নেই, মুর্তজা সাহেব। আমার জীবনটা নরক হয়ে উঠেছিল,' বলল রিজভি। মুর্তজা লক্ষ করল রিজভির চোখে সেই বুনো দৃষ্টিটা এখন অদৃশ্য। 'কিন্তু সোনিয়া আমাকে আলোর পথ দেখিয়েছে। যেদিন ও ডায়েটিং সত্ত্বেও মোটা হতে শুরু করল, লক্ষ করলাম সেদিন থেকে ও ঠিকমত খাওয়া দাওয়া শুরু করেছে, ফিরে এসেছে হাসিখুশি একটা ভাব। আমরা এখন প্রায়ই একসঙ্গে ঘুরতে বেরুই। সালেহীন সাহেব এখন আর আমাদের বিরক্ত করেন না। আমি চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছি, মুর্তজা সাহেব। চিটাগাং চলে যাচ্ছি আগামী মাসে।'

'কেন, চাকরি ছাড়লেন কেন?'

'ইদানীং কারও সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না নিজেই তো দেখছেন। এভাবে আরও কিছুদিন চললে হয়তো আমার চাকরিটাই থাকবে না। তাই আগে ভাগেই চলে যাচ্ছি।'

'চিটাগাং-এ কোন কাজ পেয়েছেন?'

'পাইনি। তবে পাব। ওখানে আমার এক বন্ধু আছে। একটা ব্যাংক চালায়। ও একটা কাজ জুটিয়ে দেবে বলেছে। যাকগে, আজকে তা হলে উঠি। দোয়া করবেন। আমারও দোয়া থাকল মিসেস রূপার জন্য। উনি নিশ্চয়ই এবার গার্ডেন ক্লাবের প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হবেন।'

রিজভি চলে যাবার পরে সিগারেটটা বিস্বাদ ঠেকল মুর্তজার কাছে। রিজভিকে আবার হিংসে হতে লাগল। দামী চাকরি দিয়ে কী হবে যদি সংসারে শান্তি না থাকে? মুর্তজা এখন আর গার্ডেন ক্লাবের সম্মান চায় না। চায় তার স্ত্রী রূপাকে আবার আগের সত্তায় ফিরে পেতে, আগের প্রেমময়ী স্ত্রী এবং স্নেহশীল মাতা

হিসাবে কাছে পেতে। মুর্তজা ঠিক করল সে আবার জটা বুড়ির কাছে যাবে।

পরদিনই রামনিধি গ্রামে চলে এল রায়হান মুর্তজা। জটা বুড়ি তাকে দেখে উৎফুল্ল ভঙ্গিতে বলল, 'কী খবর, মুর্তজা সাহেব? সব ঠিক আছে তো?'

বাংলা পাঁচের মত মুখ করে জবাব দিল মুর্তজা। 'না, কিচ্ছু ঠিক নেই। আমার স্ত্রীকে নিয়ে খুবই টেনশনে আছি, নানী। ও যে হারে শুকাতে শুরু করেছে, এভাবে চললে তো আর বেশিদিন বাঁচবে না। আপনি দয়া করে আপনার জাদু টোনা ওর ওপর থেকে ফিরিয়ে নিন, প্লিজ।'

'কিন্তু "প্লিজ" বললেই তো হবে না, মুর্তজা সাহেব। ওটা এখন আর আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।'

'আপনি যত টাকা চান দেব। এই দেখুন ব্ল্যাঙ্ক চেক নিয়ে এসেছি। আপনি শুধু অঙ্কটা বলুন।' অনুনয় করল মুর্তজা।

'টাকা দিয়েও সম্ভব নয়।'

'কী? আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।'

'আপনি শহরের শিক্ষিত মানুষ, সাহেব। আপনার সঙ্গে কোন্ সাহসে ঠাট্টা করতে যাব? ডাকিনীবিদ্যা পানির কলের মত বন্ধ আর খোলা যায় না। একবার এই বিদ্যা প্রয়োগ করলে এটা চলতেই থাকে।'

'সারা জীবন?' চমকে উঠল মুর্তজা।

'ইয়ে মানে...কারও মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত।'

'মৃত্যু! এসব কী বলছেন নানী? আগে তো এসব কথা বলেননি!'

'বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি সেবার এত উত্তেজিত ছিলেন যে আমার কথা শুনতেই চাননি।'

'কিন্তু আমাকে আপনার অবশ্যই বলা উচিত ছিল। আফটার অল জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন।'

'আমার কাজে,' গম্ভীর মুখে বলল জটা বুড়ি, 'সবসময়ই জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন। এজন্যই আমি আপনাকে প্রথমে সাবধান করে দিয়েছিলাম। তবে মানুষ মরণশীল। এ নিয়ে এত ভেঙে পড়লে চলে না।'

'তাই বলে...ও আমার স্ত্রী!'

'এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই কারও না কারও স্ত্রী কিংবা স্বামী।'

'শুনুন নানী, আমি আর কোন কথা শুনতে চাই না। আপনাকে অবশ্যই কোন না কোন ব্যবস্থা করতে হবে। সোনিয়ার শরীর থেকে আমার স্ত্রীর ওজন ফিরিয়ে আনুন, প্লিজ!' প্রায় কেঁদে ফেলার দশা হলো মুর্তজার।

জটা বুড়ি বেশ কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকল। তারপর বলল, 'একটা প্রতিযোগিতার কথা বলেছিলেন না, ওটার কী হলো?'

'গুল্লি মারেন প্রতিযোগিতা! আমার কোন প্রমোশন চাই না। আমি শুধু আমার স্ত্রীকে আবার আগের রূপে ফিরে পেতে চাই।'

'ঠিক আছে, পাবেন। তবে এ জন্য কিন্তু মূল্য দিতে হবে অনেক।'

'সমস্ত দুনিয়া আমি আপনাকে দিতে রাজি আছি।'

'পরে যেন আবার পস্তাবেন না।'

'বললাম তো আমি আর কিচ্ছু ভাবতে চাই না। আমার রূপাকে আপনি ফিরিয়ে দিন।'

'বেশ, তাই হবে। আমি কাজ শুরু করে দিচ্ছি। আপনার স্ত্রী তার আগের শরীর ফিরে পাবেন। তবে মিসেস সোনিয়ার শরীর থেকে আর ওজন ফিরিয়ে নিতে পারব না। কারণ আপনাকে তো বলেইছি এই ডাকিনীবিদ্যা ফিরিয়ে নেয়া যায় না। তবে আবার যদি এটা কাজ করে, সম্ভবত এবারই শেষবার, তা হলে যার শরীর থেকে ওজন নেব প্রক্রিয়াটা তার জীবনে সারা জীবন ধরে চলবে।'

'শুরু করুন! শুরু করুন!' চিৎকার করে উঠল মুর্তজা।

'আচ্ছা, দেখি কতদূর কী করতে পারি,' বলল জটা বুড়ি।

কপালের ঘাম মুছে গাড়িতে উঠল মুর্তজা। চুলোয় যাক প্রমোশন। এখন রূপা ভালয় ভালয় আবার আগের মত হয়ে উঠতে পারলেই তার শান্তি।

এবার পরিবর্তনটা দেখা দিল খুব তাড়াতাড়ি। দ্রুত রূপার শরীরে আবার মাংস লাগল, ঝলমল করে উঠল হাসি মুখ, বাচ্চারা তাদের মাকে আবার আগের রূপে পেয়ে ভারী খুশি। ওদের চেয়েও বেশি খুশি রায়হান মুর্তজা। সে ঠিক করল আগামী শনিবার অফিসে যাবে না। পরিবার নিয়ে সকালে চলে যাবে জয়দেবপুরে, পিকনিক করবে। অফিস থেকে ছুটি নিল সে ওইদিন। বাচ্চারা রেডি হয়ে আগে ভাগে গাড়িতে গিয়ে বসল। রূপা মুর্তজা এখনও দেরি করছে কেন দেখার জন্যে তাদের বেডরুমে ঢুকল। দেখল মুর্তজা তার গায়ের সুটটার দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে আছে। রূপাকে দেখে সে চোখ তুলে চাইল, কথা বলার সময় কেঁপে গেল গলা। 'জানো,' ভীত কণ্ঠে বলল মুর্তজা, 'এই সুটটা না আমার গায়ে ঢোলা লাগছে…।'

নির্যাতন

মৃত্যুর আগে উইলিয়াম পার্ল খুব সামান্য অর্থ রেখে গিয়েছিল স্ত্রী মেরীর জন্য। উইলিয়ামের মৃত্যুর হপ্তাখানেক পর তার আইনজীবী মেরীকে একটি খাম দিয়ে বলল, 'আমাকে বলা হয়েছে এটা আপনাকে পৌঁছে দিতে। জিনিসটা সম্ভবত ব্যক্তিগত। কাজেই বাসায় গিয়ে খাম খুললেই ভাল হবে।'

মিসেস পার্ল খামটা নিয়ে, কোন কথা না বলে চলে এল বাড়িতে। খামটা খোলার আগে এক মুহূর্ত চিন্তা করল। এর মধ্যে ফর্মাল কোন চিঠি থাকতে পারে। উইলিয়ামের ব্যবহারে কখনও ইনফরমাল কিছু দেখেনি মেরী। লোকটা অভিনয়

করতে জানত না। মেরীর সঙ্গে কোনদিন অভিনয় করেওনি। মেরীর ধারণাই ঠিক। খাম খুলে একটা ফর্মাল চিঠিই পেল সে। তাতে লেখা: আমার প্রিয় মেরী, আমার বিশ্বাস আমার চির বিদায়ে তুমি খুব বেশি ভেঙে পড়বে না, বরং নিজের কাজগুলো ঠিকঠাকমত চালিয়ে যাবে। আর টাকা-পয়সা খরচ করার ব্যাপারে সতর্ক থেকো···ইত্যাদি ইত্যাদি।

খামের ভিতর চিঠি ছাড়াও একগুচ্ছ কাগজ চোখে পড়ল তার। বেশ মোটা কাগজের তাড়াটা। কাগজের তাড়াটা কৌতূহলী করে তুলল মিসেস পার্ল ওরফে মেরীকে। সে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর মন দিল পড়ায়। ছোট, স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা। ভাষা সাবলীল। উইলিয়ামের আত্মজীবনী বলা চলে।

কিন্তু এ কেমন আত্মজীবনী? একটানে লেখাটা পড়ে ফেলল মেরী। তারপর স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। তারপর আবার পড়া শুরু করল। এবার ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ আর বাক্য যেন মগজে ঢুকিয়ে নিল সে।

প্রিয় মেরী, এই লেখাটি একান্ত তোমারই জন্যে। আমি চলে যাবার কয়েকদিন পর তোমার কাছে লেখাটি হস্তান্তর করা হবে। তবে লেখাটি পড়ে ভয় পেয়ো না। এটা আর কিছু নয়, ল্যান্ডি আমাকে নিয়ে কী করতে চলেছে তারই একটি ব্যাখ্যা মাত্র। আর তার কাজে আমি কেন সম্মতি জানিয়েছি, তার থিওরি এবং প্রত্যাশা সবকিছুর ব্যাখ্যাই তুমি এর মধ্যে পাবে। গোটা ব্যাপার জানার অধিকার তোমার আছে। কারণ তুমি আমার স্ত্রী। অবশ্য এর আগে বহুবার ব্যাপারটা তোমার কাছে বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তুমি শুনতে চাওনি। পুরো ব্যাপারটা জানার পর তোমার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে হয়তো। হয়তো আমাকে নিয়ে গর্বও হবে তোমার। আমি জানি আমার সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। তাই কাজটা করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করিনি। সতেরো বছর আমি কাটিয়েছি অক্সফোর্ডে। এখানে পড়াশোনা শেষ করে অধ্যাপনা শুরু করেছি। কাজেই যখন জানতে পারলাম প্রিয় এ জায়গা থেকে চিরদিনের জন্য চলে যেতে হবে, কারণ ক্যান্সার হয়েছে আমার, স্বভাবতই মুষড়ে পড়লাম। আর ক্যান্সারটা ধরা পড়েছে এমন এক সময়ে যে, বেঁচে থাকার কোন আশাই নেই। ধীরে ধীরে নিঃশব্দ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। তারপর, হপ্তা ছয়েক আগে, মঙ্গলবারের এক সকালে ল্যান্ডি এল আমার সাথে দেখা করতে। তারপর সবকিছু কেমন যেন ওলোট পালোট হয়ে গেল। হাসপাতালের বেডে শুয়েছিলাম আমি। ল্যান্ডি এল খুব সকালে। তখনও তোমার আসতে অনেক দেরি। ওকে তো তুমি চেন। যেখানে যায়, মনে হয় যেন ঝড় এসেছে। হাসি, আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের তাজা বোমা একটা। হাসতে হাসতে ঢুকল ও আমার কেবিনে। দাঁড়াল বিছানার পাশে। ঝকঝকে চোখ মেলে কিছুক্ষণ দেখল আমাকে। তারপর বলল, 'উইলিয়াম, দোস্তো। এতদিনে যা চেয়েছি পেয়ে গেছি আমি। তোমার মত একটি কেসই চেয়েছি এতদিন।' জন ল্যান্ডির সাথে তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই তোমার। ও খুব একটা আমাদের বাড়িতে যায়ওনি। তবে ওর সাথে আমার বন্ধুত্বের বয়স নয় বছর

হলো। দর্শনের শিক্ষক হলেও মনোবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ আমার প্রচুর। ল্যান্ডিরও তাই। ফলে দু'জনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় লাগেনি।

যা হোক, ল্যান্ডি আমার বিছানার পাশের একটা চেয়ারে বসে বলল, 'তুমি আর ক'দিনের মধ্যেই মারা যাচ্ছ, তাই না?'

এ ধরনের সরাসরি প্রশ্ন ল্যান্ডির মত মানুষকেই মানায়। তবে বলার ভঙ্গিটা এমন যে, মৃত্যুপথযাত্রী মানুষও কিছু মনে করতে পারবে না ওর কথায়।

'তুমি মারা যাবার পর ওরা তোমাকে কবর দেবে,' বলে চলল ল্যান্ডি, 'তুমি কী মনে কর, তারপর স্বর্গে চলে যাবে?'

'এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে,' বললাম আমি।

'নাকি নরকে?'

'নরকে যাবার মত অপরাধ তো আমি করিনি, কিন্তু এসব কথা কেন ল্যান্ডি?'

'কারণ' আমাকে সতর্কভাবে লক্ষ করল ও। 'আমি জানি মৃত্যুর পর তুমি জানতেও পারবে না তোমার কোথায় জায়গা হলো, তোমাকে কে কী বলল, যদি না...' থামল সে, মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে, আরও কাছে এগিয়ে এল। '...যদি না তোমার সমস্ত ভার আমার হাতে তুলে দিয়ে না যাও। তোমাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, গ্রহণ করবে?'

আমার দিকে এমন ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল ও যেন আমি সরেস গরুর চর্বিদার একটা রান, ঝোলানো হয়েছে আমাকে দোকানে, ও মাংসের টুকরোটা কিনে নিয়েছে, র‍্যাপিং পেপারে মুড়িয়ে দেওয়ার অপেক্ষায় আছে।

'কথাটা খুব সিরিয়াস, উইলিয়াম। একটা প্রস্তাব দেব। গ্রহণ করবে কিনা?'

'তোমার কথার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'সব কিছুই তোমাকে ব্যাখ্যা করব। শুনবে আমার কথা?'

'বলো শুনি। কারণ, কথা শুনতে আমার কোন ক্ষতি নেই। বরং লাভ। বিশেষ করে মৃত্যুর পরে লাভবান হবে, যদি আমার প্রস্তাব মেনে নাও।' শুনে লাফিয়ে উঠলাম আমি। ল্যান্ডি বলতে শুরু করল:

'একটা জিনিস নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে আমি গবেষণা করে চলেছি, উইলিয়াম। এখানকার দু'একটি হাসপাতাল আমাকে গবেষণার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করছে। ল্যাবরেটরির প্রাণীদের ওপর সফল এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছি আমরা। এখন শুধু মানুষের ওপর এক্সপেরিমেন্ট বাকি। আমার ধারণা, আমি সে এক্সপেরিমেন্টেও সফল হব।'

বিরতি দিল ল্যান্ডি। ঝুঁকে এল আমার দিকে। ওর চোখ জ্বলজ্বল করছে উত্তেজনায়, তীব্র আলো যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে চোখের মণি থেকে। যেন আমাকে বলতে চাইছে, একমাত্র আমিই তোমাকে রক্ষা করতে পারি।

আবার শুরু করল ল্যান্ডি:

'বেশ অনেকদিন আগে একটি রাশান শর্ট মেডিকেল ফিল্ম দেখেছিলাম। ছবিটি ভয়ংকর তবে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষকও। ছবিটিতে দেখিয়েছে—একটি কুকুরের

ধড় থেকে মুণ্ডু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে, কিন্তু মস্তিষ্ক বা ব্রেনের ভেতর কৃত্রিম হৃদপিণ্ডের আর্টারি এবং ভেইন থেকে স্বাভাবিক রক্ত সরবরাহ করা হচ্ছে। অবাক ব্যাপার হলো—একটা ট্রের মধ্যে বসানো কুকুরটার মাথা ছিল জ্যান্ত! ওটার ব্রেন কাজ করছিল। নানা টেস্টের মাধ্যমে ওরা ব্যাপারটা প্রমাণ করেছে। যেমন, যখন খাবার দেওয়া হত, খাবার কুকুরটার মুখের সামনে ধরলে ওটার জিভ বেরিয়ে আসত, খাবার চেটে খেত। ঘরের ভিতর কেউ ঢুকলে তাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করত কুকুরটা।

'এ থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়—মাথা এবং মস্তিষ্ক দুটোর কোনটারই জ্যান্ত থাকার জন্যে শরীরের বাকি অংশের অবলম্বনের প্রয়োজন পড়েনি। শুধু অক্সিজেন মেশানো রক্তের সরবরাহই কাটা মুণ্ডুটাকে বাঁচিয়ে রাখছিল।

'ওই ছবিটি দেখার পর আমার মাথায় একটি বৈপ্লবিক চিন্তা চলে আসে। আমি ভাবতে থাকি মৃত্যুর পর কোন মানুষের খুলি থেকে ব্রেন খুলে নিয়ে তাকে যদি কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা যায়, কেমন হয়? এরপর আমি এ বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিই। আর মানুষ নিয়ে গবেষণার জন্যে তোমাকে আমি বেছে নিয়েছি, বন্ধু। কারণ তুমি তো আর ক'টা দিন পর মরেই যাবে।'

'ঠাট্টাচ্ছলে জানতে চাইলাম কাজটা সে কীভাবে করবে। এর দীর্ঘ এবং জটিল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমাকে দিয়েছে ল্যান্ডি। কিন্তু সে বর্ণনায় গিয়ে আমি তোমার বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না, মেরী। আর তা তুমি বুঝবেও না। শুধু এটুকু বলি, ল্যান্ডি এমন একটি আজব যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, যার মধ্যে রয়েছে একটি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড। এটি অক্সিজেন মেশানো রক্ত উৎপাদন করবে সঠিক তাপমাত্রাসহ, সে রক্ত পাম্প করে আমার ব্রেনে সরবরাহ করা হবে, আমার মৃত্যুর পরে। আর এই পদ্ধতিতে নাকি বছরের পর বছর আমার ব্রেন বেঁচে থাকবে, মানে আমি বেঁচে থাকব! কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের কখনও ক্ষয় হবে না, রক্ত সরবরাহ থাকবে নিয়মিত। তাতে কোনদিন ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকবে না। এবং আমার ব্রেন নাকি দুই থেকে তিন শতাব্দী এভাবে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

'পরিকল্পনাটা রোমহর্ষক এবং উত্তেজক তো বটেই। শুরুতে অবশ্য ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। রাজি হইনি। পরে ভাবলাম মরে তো যাচ্ছিই। তবু বিজ্ঞানের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করলে ক্ষতি কী? তা ছাড়া ল্যান্ডির উদ্ভট গবেষণা সফল হলে, আবার আমি বেঁচে উঠব। বেঁচে থাকতে পারব টানা তিনশোটি বছর। ইতিহাস সৃষ্টি করব আমি। আবার বেঁচে ওঠার প্রবল উন্মাদনা পেয়ে বসল আমাকে। ল্যান্ডিকে বললাম অপারেশনের জন্যে আমি প্রস্তুত। অবশ্য অপারেশনটা হবে আমার মৃত্যুর সাথে সাথে। কারণ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবার চার থেকে ছয় মিনিটের মধ্যে অক্সিজেন এবং তাজা রক্তের সরবরাহের অভাবে অকেজো হয়ে যায় মস্তিষ্ক বা ব্রেন। কাজেই এর আগেই অপারেশনটা করতে হবে। তবে ল্যান্ডি জানিয়েছে তার আশ্চর্য মেশিনের কারণে আমার ব্রেন কোনভাবেই ড্যামেজ হবে

না। অপারেশনে আমার মাথাটা কেটে আলাদা করে রাখা হবে একটা বেসিনে। মূলত ওটাই হবে এরপর থেকে আমার ঘরবাড়ি।

'ল্যান্ডি বলেছে, অপারেশনের পরে সবকিছুই আমি দেখতে পাব। এমনকী খবরের কাগজ বা বইও পড়তে পারব। তবে শুরুতে একটি নির্দিষ্ট সীমানায় এটির আওতা সীমাবদ্ধ থাকবে। পরে ধীরে ধীরে এর পরিধি বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য আমি মানুষের কথা শুনতে পাব না। শোনার ক্ষমতা দাবি করেছিলাম ল্যান্ডির কাছে। ল্যান্ডি বলেছে, ওটার ব্যবস্থা করা এ মুহূর্তে তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর কথাও বলতে পারব না। কারণ আমার তো মুখই থাকবে না। শুধু চোখে দেখার জন্যে আমার ব্রেনের সাথে একটি কৃত্রিম মণি লাগিয়ে দেয়া হবে। আমি যে সচেতন অবস্থায় আছি, সবকিছু দেখতে পাচ্ছি, এটা জানা যাবে ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফের সাহায্যে। ইলেকট্রোডগুলো সরাসরি আমার মস্তিষ্কের সামনের অংশের সাথে জোড়া লাগানো থাকবে। শেষে ল্যান্ডি বলল, 'তুমি অসাধারণ এক ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছ, উইলিয়াম। তোমাকে কেউ বা কোন কিছু বিরক্ত করবে না। তুমি কোন যন্ত্রণাও অনুভব করবে না। কারণ যন্ত্রণা অনুভব করার মত কোন নার্ভ তোমার থাকবে না। ভয়, দুঃখ, তৃষ্ণা, খিদে কোন কিছুই তোমাকে স্পর্শ করবে না। এমনকী কোন রকম জৈবিক কামনাও জাগ্রত হবে না। শুধু ব্রেনের মধ্যে থাকবে তোমার স্মৃতিশক্তি, তোমার চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি। কে জানে একদিন হয়তো অসাধারণ কোন সূত্র তুমি আবিষ্কার করে বসবে!'

'আমি অসাধারণ কোন কিছু আবিষ্কার করে ফেলব কিনা জানি না। তবে এটা যে অসাধারণ একটা ব্যাপার ঘটতে চলেছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

'আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সাথে বহুবার কথা বলতে চেয়েছি, মেরী। কিন্তু তুমি আমার কোন কথাই শুনতে চাওনি। তারপর ব্যাপারটি লিখে যাবার সিদ্ধান্ত নিই। অবশ্য দীর্ঘ সময় লেগেছে লিখতে। তবে তোমাকে "বিদায়" বলব না। কারণ ছোট্ট একটা চান্স আছে। ল্যান্ডি যদি তার কাজে সফল হয়, আবার হয়তো তোমার সাথে দেখা হবে আমার। 'আমি আমার উকিলকে বলে যাব এ লেখাটি যেন আমার মৃত্যুর এক হপ্তা পর তোমার কাছে হস্তান্তর করা হয়। এখন, যখন তুমি লেখাটি পড়ছ, ল্যান্ডির অপারেশনের পর সাতদিন চলে গেছে। গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে তুমি অবহিত হলে। জানি না এখন কী করবে, তবে আমার অনুরোধ–ল্যান্ডির সাথে দেখা করো। আমি তাকে বলেছি তুমি সাত দিনের দিন তার সাথে দেখা করবে।

তোমার বিশ্বস্ত স্বামী
উইলিয়াম

বি: দ্র: আমি চলে যাবার পর থেকে সবসময় ভদ্রভাবে চলাফেরার চেষ্টা করবে, মনে রাখবে বৈধব্য খুব কঠিন জিনিস। মদ পান করবে না। অহেতুক টাকা ওড়াবে না। সিগারেট খাবে না। তুমি জান আমি নিজে সিগারেট খাইনি কোনদিন, কারও খাওয়া পছন্দও করি না। দোকানের পেস্ট্রি খাবে না। লিপস্টিক মাখবে না।

টেলিভিশন অ্যাপারেটাস কিনবে না। গরমের সময় আমার ফুল গাছে নিয়মিত পানি দেবে। আর আমার ফোন ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই বলে আশা করছি লাইনটা কেটে দেবে।'

মিসেস পার্ল পাণ্ডুলিপির শেষ পাতাটি আস্তে রেখে দিল সোফার উপর। তার ছোট্ট মুখখানা কঠিন আকার ধারণ করেছে, ফুলে উঠেছে নাকের পাটা। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে বীভৎস লাগছে। লেখাটার কথা মনে পড়তে শিউরে উঠল গা।

ব্যাগ খুলে আরেকটা সিগারেট বের করল সে, ধরাল। ঘন ঘন টানে ধোঁয়ায় ভরিয়ে ফেলল ঘর। ধোঁয়ার মেঘের ভিতর থেকেও স্থির তাকিয়ে রইল নতুন কেনা নতুন মডেলের বিশাল আকারের টেলিভিশনের দিকে। টিভিটা উইলিয়ামের টেবিলের উপর রেখে দিয়েছে সে। উইলিয়াম যদি দৃশ্যটা দেখত কী বলত, ভাবল মিসেস পার্ল।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল বছর খানেক আগের একটা ঘটনা। রান্নাঘরের খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সে মাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছে, রেডিওতে উচ্চস্বরে ড্যান্স মিউজিক বাজছে, এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ওখানে তার স্বামী এসে হাজির। মেরীকে সিগারেট খেতে আর গান শুনতে দেখে কী ভয়ানক রেগে গিয়েছিল উইলিয়াম! তারপর থেকে সে স্ত্রীর হাতখরচা বন্ধ করে দেয়। মেরীর সিগারেট খাওয়া দু'চক্ষে দেখতে পারত না উইলিয়াম। তার এক কথা–যে জিনিস উইলিয়ামের অপছন্দ তার স্ত্রী তা খাবে কেন? অনেক কিছুই অপছন্দ ছিল উইলিয়ামের। এমনকী বাচ্চা-কাচ্চাও পছন্দ করত না বলে মেরী মা হতে পারেনি।

এখন কোথায় গেল তোমার পছন্দ-অপছন্দ? মনে মনে হাসল মিসেস পার্ল।

সিগারেট শেষ করল সে। তারপর আরেকটা ধরিয়ে পা বাড়াল টেলিফোনের দিকে। টিভি সেটের পাশেই ওটা রাখা। উইলিয়ামের মৃত্যুর পরেও সে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেনি। এদিকে উইলিয়াম বিশেষভাবে অনুরোধ করে গেছে মেরী যেন অবশ্যই ড. ল্যান্ডির সাথে যোগাযোগ করে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে, তারপর ইনডেক্স খুঁজে ল্যান্ডির নাম্বার বের করল।

'আমি ড. ল্যান্ডির সাথে কথা বলতে চাই, প্লিজ!'

'কে বলছেন?'

'মিসেস পার্ল। মিসেস উইলিয়াম পার্ল।'

'এক মিনিট, প্লিজ!'

একটু পরেই ল্যান্ডির কণ্ঠ ভেসে এল।

'মিসেস পার্ল?'

'জ্বী, বলছি।'

এক মুহূর্ত নীরব থাকল ওপাশ।

'অবশেষে ফোন করলেন, মিসেস পার্ল! আমি সত্যি খুব খুশি হয়েছি।

একবার আসবেন হাসপাতালে? তা হলে কথা বলা যেত। আপনি বোধহয় ঘটনাটা জানার জন্যে আগ্রহী হয়ে আছেন, না?'

মিসেস পার্ল নিশ্চুপ রইল।

'সবকিছুই চমৎকারভাবে শেষ হয়েছে। ওটা শুধু জীবিত নয়, মিসেস পার্ল, ওটা সচেতন। দ্বিতীয় দিনেই ওটার জ্ঞান ফিরেছে। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, নয় কী?'

মিসেস পার্ল ল্যান্ডিকে বলে যাবার সুযোগ দিল। 'আর ওটা দেখতে পাচ্ছে। প্রতিদিন ওটাকে খবরের কাগজও পড়তে দিচ্ছি।'

'কী কাগজ?' তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল মিসেস পার্ল।

'ডেইলী মিরর। পত্রিকাটার হেডলাইনগুলো বড়বড়। পড়তে সুবিধা।'

'ও মিরর পত্রিকা পড়ে না। ওকে টাইমস দেবেন।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর ডাক্তার বলল, 'ঠিক আছে, মিসেস পার্ল। তাই দেব। ওটাকে খুশি আর সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টাই করে যাচ্ছি।'

'ওটা ওটা করছেন কেন, ঝাঁঝিয়ে উঠল মিসেস পার্ল। 'বলুন ওকে!'

'জ্বী, ওকে,' বলল ডাক্তার। 'দুঃখিত, মাফ করবেন। যা হোক, ওকে খুশি রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তাই আপনাকে আসতে বলছি। ও আপনাকে দেখলে খুশিই হবে।'

দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইল মিসেস পার্ল। তারপর বলল, 'আচ্ছা। আসছি আমি।'

'আসলে খুব ভাল হবে। জানতাম আপনি আসবেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা করব আমি। সোজা দোতলায় চলে আসবেন।'

আধঘণ্টা পর হাসপাতালে পৌঁছে গেল মিসেস পার্ল।

'ওকে দেখে আশাকরি অবাক হবেন না,' ডক্টর ল্যান্ডি ওর পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল।

'হব না।'

'প্রথম দর্শনে শক্‌ড্‌ হতে পারেন। আসলে ওর বর্তমান চেহারাটা খুব একটা দর্শনযোগ্য নয়।'

'আমি চেহারা দেখে ওকে বিয়ে করিনি, ডক্টর।' ঘুরল ল্যান্ডি, সরাসরি তাকাল মিসেস পার্লের দিকে।

কী অদ্ভুত এক মহিলা, ভাবল সে। একসময় দেখতে সুন্দরী ছিল। এখন ক্লান্ত, জীবনযুদ্ধে পরাজিত, বিপর্যস্ত লাগছে। খানিক চুপচাপ হাঁটল ওরা।

'ভেতরে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠবেন না,' বলল ল্যান্ডি। 'সরাসরি ওর মুখের দিকে না তাকানো পর্যন্ত ও বুঝতেই পারবে না যে আপনি এসেছেন। ওর চোখ সবসময় খোলা থাকে। তবে চোখের মণি নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই। কাজেই ওর দেখার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। বর্তমানে আমরা ওকে ছাদের দিকে তাকানো অবস্থায় রেখেছি। আর হ্যাঁ, ও কিছুই শুনতে পায় না। কাজেই যে কোন কথা

বলতে পারবেন মন খুলে। এই যে, এসে পড়েছি।'

ল্যান্ডি একটা দরজা খুলল, মিসেস পার্লকে ছোট, চৌকোনা ঘরটাতে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। 'আমি ওর খুব বেশি কাছে যেতে চাই না,' মিসেস পার্লের বাহুতে হাত রেখে বলল সে। 'এখানে একটু দাঁড়িয়ে ধাতস্থ হয়ে নিন।'

ঘরের মাঝখানে, উঁচু, সাদা একটা টেবিলের উপর বড় আকারের সাদা এনামেল বাটির মত একটা ওয়াশ বেসিন দাঁড় করানো। বেসিন থেকে আধা ডজন প্লাস্টিক টিউব বেরিয়ে এসেছে। টিউবগুলো কতগুলো কাঁচের পাইপের সাথে সংযুক্ত। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, একটা মেশিন থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত গড়িয়ে নামছে পাইপ থেকে। ল্যান্ডি জানাল, ওটার নাম হার্ট মেশিন। ওটাই রক্ত সরবরাহ করে বাঁচিয়ে রেখেছে উইলিয়ামকে। হার্ট মেশিন থেকে ছন্দায়িত মৃদু শব্দ আসছে।

'ওটার মধ্যে আছে,' বেসিনের দিকে ইঙ্গিত করল ডাক্তার। 'এতদূর থেকে পরিষ্কার দেখতে পাবেন না। একটু কাছে যান। তবে খুব বেশি কাছে নয়।'

ল্যান্ডি মিসেস পার্লকে নিয়ে দুই কদম সামনে বাড়ল।

ঘাড় লম্বা করে মিসেস পার্ল দেখল বেসিনের ভিতরটা তরল একটা পদার্থে বোঝাই। তরল জিনিসটা পরিষ্কার এবং স্থির। তার উপর ভাসছে গোলাকার একটা ক্যাপসুল, আকারে কবুতরের ডিমের সমান।

'ওটা ওর চোখ,' বলল ল্যান্ডি। 'দেখতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'চোখটা খুব ভাল অবস্থায় আছে। ওটা ওর ডান চোখ। ওই চোখে সে আগের মতই দেখতে পায়।'

'ছাদ দেখার মধ্যে মজার কিছুই নেই,' মন্তব্য করল মিসেস পার্ল।

'শুধু ছাদ দেখতে হবে না ওকে। সে ব্যবস্থাও আমরা করব। তবে এত দ্রুত তা সম্ভব নয়।'

'ওকে ভাল কোন বই পড়তে দিন।'

'অবশ্যই দেব। আপনার কোন সমস্যা হচ্ছে না তো, মিসেস পার্ল?'

'না।'

'তা হলে আরেকটু সামনে এগোই, চলুন। গোটা জিনিস পরিষ্কার দেখতে পাবেন।'

টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল ল্যান্ডি মিসেস পার্লকে নিয়ে।

'ওই দেখুন,' বলল ল্যান্ডি। 'ওই যে আমাদের উইলিয়াম।'

যা ভেবেছিল তারচে' প্রকাণ্ড লাগল উইলিয়ামকে, আর রক্তটাও অনেক বেশি গাঢ়। সারফেসের উপর নানা ভাঁজ আর বলিরেখা নিয়ে উইলিয়াম বড় আকারের শুঁটকি করা একটা আখরোটের আকার পেয়েছে। চারটে বড় ধমনী আর দুটো শিরা বেরিয়ে আছে ওর ব্রেনের সম্মুখভাগ থেকে, ঢুকেছে প্লাস্টিক টিউবের মধ্যে, হার্ট মেশিনের প্রতিটি স্পন্দনের সাথে, রক্ত যখন ঢুকছে, এক সাথে সবগুলো

টিউব মৃদু ঝাঁকি খাচ্ছে।

'ঝুঁকে সরাসরি চোখের দিকে তাকান,' পরামর্শ দিল ল্যান্ডি। 'তা হলে ও আপনাকে দেখতে পাবে। আপনি ওর দিকে তাকিয়ে হাসুন, চুমু খাওয়ার ভঙ্গি করুন। সম্ভব হলে ভাল ভাল কিছু কথা বলুন। শুনতে না পেলেও কী বলছেন বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই।'

'চুমু খাওয়ার ভঙ্গি করাটা ও মোটেই পছন্দ করবে না,' বলল মিসেস পার্ল। 'আমি বরং অন্যভাবে ওর সাথে কথা বলি। কিছু মনে করবেন না।' সে টেবিলের কোনায় গিয়ে দাঁড়াল, ঝুঁকল বেসিনের উপর। সরাসরি তাকাল উইলিয়ামের চোখের দিকে।

'হ্যালো ডিয়ার,' ফিসফিস করল সে। 'এই যে আমি–মেরী।'

উজ্জ্বল চোখটা অদ্ভুত কটমট করে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'কেমন আছ, প্রিয়,' জিজ্ঞেস করল সে। 'ঠিক আছ তো?'

স্বচ্ছ প্লাস্টিক ক্যাপসুলের মধ্যে চোখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চোখের বরফ নীল মণির চারদিকের সাদা জমিনের উপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লালচে শিরাগুলোও স্পষ্ট। মনে হলো মিসেস পার্লের কথা শুনে কেঁপে উঠল মণিটা।

'তোমার চিঠি পেয়েছি, ডিয়ার। সাথে সাথে ছুটে এসেছি দেখতে। ড. ল্যান্ডি বললেন, তুমি নাকি ভালই আছ। আস্তে আস্তে বললে তুমি হয়তো আমার ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারবে কী বলছি।'

সন্দেহ নেই চোখটা দেখছে ওকে।

'ওরা তোমার যত্নআত্তির কোন ত্রুটি করছে না, ডিয়ার। চমৎকার হার্ট মেশিনটা নিয়মিত পাম্প করে চলেছে। আমাদের দুর্বল হার্টের চেয়ে ওটা অনেক বেশি শক্তিশালী। আমাদের হার্ট যে কোন সময় অকেজো হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তোমারটার সে সম্ভাবনা নেই।'

কাছ থেকে চোখটাকে দেখছে মিসেস পার্ল, বোঝার চেষ্টা করছে ওটার ভাষা।

'তুমি বেশ আছ, ডিয়ার। সত্যি ভাল আছ।'

চোখটার মধ্যে কোথায় যেন কোমলতা আর দয়ার ছায়া লক্ষ করল মিসেস পার্ল, যা আগে কখনও দেখেনি।

'আপনি কি নিশ্চিত ও সচেতন?' ডাক্তারের দিকে তাকাল সে।

'অবশ্যই।' জবাব দিল ডাক্তার।

'আমাকে দেখতে পাচ্ছে?'

'একশোবার।'

'ব্যাপারটা দারুণ, না? ও নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছে সবকিছু দেখে।'

'ওর অবাক হবার কিছু নেই। সে খুব ভালভাবেই জানে সে কোথায় এবং কেন। যদি কথা বলার ক্ষমতা থাকত, তা হলে আপনার সাথে আলাপও চালিয়ে যেত।'

কথা বলতে পারে না বলেই আমার উপর আর বিধি-নিষেধের বেড়াজাল আরোপ করতে পারবে না, ভাবল মিসেস পার্ল। তুমি অনেক ভুগিয়েছ আমাকে। এবার আমার পালা।

'ভাল কথা, ডক্টর,' বলল সে, 'ওকে আমি কখন বাড়ি নিয়ে যেতে পারব?'

'মানে?'

'বললাম কখন ওকে বাড়ি নিয়ে যাবার অনুমতি পাব।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন,' বলল ল্যান্ডি।

ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল মেরী, ঠাণ্ডা চোখে তাকাল ল্যান্ডির দিকে।

'আমি কেন আপনার সাথে ঠাট্টা করতে যাব।'

'ওকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয় বুঝতে পারছি না।'

'এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট, মিসেস পার্ল!'

'ও আমার স্বামী, ড. ল্যান্ডি।' নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল ল্যান্ডি। 'ইয়ে মানে...'

'ও আমার স্বামী,' কণ্ঠে রাগ নেই, খুব শান্ত গলায় কথাটা পুনরাবৃত্তি করল মেরী। যেন ডাক্তারকে মনে করিয়ে দিল সাধারণ ব্যাপারটা।

'সবাই জানে, আপনি এখন বিধবা, মিসেস পার্ল,' জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল ল্যান্ডি। 'কাজেই আপনার দাবি ত্যাগ করা উচিত।'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল মিসেস পার্ল, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'যা বলার বলে দিয়েছি,' ব্যাগ খুলে সিগারেট বের করল। 'আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যাব।'

দুই ঠোঁটের ফাঁকে ওকে সিগারেট গুঁজতে দেখল ল্যান্ডি, সিগারেট ধরাল। এ মহিলা সত্যি অদ্ভুত, আবার ভাবল সে। বেসিনে স্বামীকে অমন অবস্থায় দেখে মনে হয় মজাই পেয়েছে।

ওখানে তার স্ত্রীর ব্রেন যদি ওভাবে পড়ে থাকত আর তার স্ত্রী ক্যাপসুলের মাঝ থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকত, তা হলে কেমন হত?

মোটেই ভাল লাগত না ল্যান্ডির।

'আমার ঘরে যাবেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস পার্ল, শান্ত-নিরুদ্বেগ চেহারা নিয়ে সিগারেট ফুঁকে চলেছে।

'জ্বী,' জবাব দিল সে।

টেবিলের ধার দিয়ে যাবার সময় দাঁড়িয়ে পড়ল মিসেস পার্ল, আবার ঝুঁকল বেসিনের উপর।

'মেরী চলে যাচ্ছে, সুইট হার্ট,' বলল সে। 'তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি। ওখানে ঠিকমত যত্ন-আত্তি করতে পারব তোমার। আর শোন, ডিয়ার...'

হাসল সে, ঠোঁটে আবার সিগারেট গুঁজল, ভঙ্গি করল টান দেওয়ার। চোখটা জ্বলে উঠল ভীষণভাবে।

চোখের দিকে সরাসরি তাকাল মিসেস পার্ল, মণির ঠিক মাঝখানে আলো দেখতে পেল। যেন আগুন জ্বলছে। প্রচণ্ড রাগ নিয়ে তাকিয়ে আছে চোখটা তার দিকে।

নড়ল না মিসেস পার্ল, বেসিনের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল। এবার ঠোঁটে গোঁজা সিগারেটে মস্ত টান দিল। ফুসফুসের মধ্যে ধোঁয়াটা ধরে রাখল তিন/চার সেকেন্ড। তারপর হুশ্‌শ্‌ শব্দে নাকের দুই ফুটো দিয়ে ধোঁয়ার পাতলা দুটো স্রোত বেরিয়ে এল, সরাসরি আঘাত করল বেসিনের পানিতে, সারফেসে ঘন নীল মেঘের ঢেউ সৃষ্টি করল, বুজিয়ে দিল চোখটা।

ল্যান্ডি দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, ডাক দিল, 'আসুন, মিসেস পার্ল।'

'ওভাবে কটমট করে তাকাবে না, উইলিয়াম,' নরম গলায় বলল মিসেস পার্ল। 'কটমট করে তাকালে দেখতে ভাল লাগে না।'

ল্যান্ডি ঘুরল, ঘাড় লম্বা করল, মহিলা কী করছে দেখতে চায়।

'অনেক হয়েছে,' ফিসফিস করল মিসেস পার্ল। 'এখন থেকে মেরীর আদেশেই তোমাকে চলতে হবে। বোঝা গেছে?'

'মিসেস পার্ল,' বলল ল্যান্ডি, এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

'কাজেই আর দুষ্টুমি করা চলবে না,' আবার সিগারেটে টান দিল সে। 'দুষ্টুমি করলে অনেক দুর্ভোগ আছে তোমার কপালে।'

ল্যান্ডি চলে এসেছে ওর পাশে, হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল।

'বিদায়, প্রিয়,' গলা ছেড়ে বলল মিসেস পার্ল। 'আমি শীঘ্রি আসছি।'

'অনেক হয়েছে, মিসেস পার্ল।'

'ও খুব সুইট, না?' ল্যান্ডির দিকে বড় বড় চোখ রেখে বলল সে। 'তাই না, ডার্লিং? ওকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে আর তর সইছে না আমার।'

***